ধনবিজ্ঞান

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত

ধনবিজ্ঞান

শ্রীভবতোষ দত্ত

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

18.9.46.

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় আর্থিক প্রচেষ্টা অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রচেষ্টা বহুমুখী এবং বহুরূপী। গ্রামের চাষীর কৃষিকার্য, তাঁতীর তাঁত চালানো, কামারের হাতুড়ি ঠোকা থেকে আরম্ভ করে বিরাট যন্ত্রশিল্প, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য— সব-কিছুরই প্রধান সার্থকতা ব্যক্তির এবং সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে। মানুষের অভাব অনেক; সে অভাব মেটাতে গেলে নানারকম কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য এক হওয়াতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এগুলির আলোচনা করলে হয়তো সর্বত্র প্রযোজ্য কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বার করে নেওয়া যেতে পারে। আপাতবিভিন্ন বহুর মধ্য থেকে সাধারণ নিয়ম বার করে বিজ্ঞান। নানাপ্রকারের জড়পদার্থ পরীক্ষা করে এমন কতগুলি সহজ কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়, যা সব ক্ষেত্রেই খাটে, যেমন মাধ্যাকর্ষণ; যে শাস্ত্র এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে তাকে আমরা বলি পদার্থবিজ্ঞান। ঠিক সেইরকম, মানুষের নিজের এবং সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যে নানারকমের চেষ্টা চারদিকে চলেছে তার মধ্যেও কয়েকটি সহজ কার্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়; যে আলোচনা দিয়ে এগুলিকে আবিষ্কার করে নেওয়া যায় তার নাম ধনবিজ্ঞান।

ধনবিজ্ঞানের ঠিক বিষয়বস্তুটি কি, মানুষের প্রচেষ্টার পর্যালোচনাকে বিজ্ঞান নাম দেওয়া চলে কি না ইত্যাদি নানাপ্রকারের অনেক বিতর্ক

গত শতাব্দীতে এবং আধুনিক কালে হয়ে গেছে। এসব তর্কের ভিতরে না গিয়েও কয়েকটা সহজ কথা বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের চারদিকে তাকালে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে যে, কোনো ব্যক্তির নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টার ফলাফল সে নিজে একাই ভোগ করে না, সমাজের উপরেও তার একটা প্রভাব আছে। অবশ্য প্রত্যেকের কাছে তার নিজের স্বার্থটাই বড়, অন্যের উপরে কি প্রভাব হয় সেদিকে লক্ষ্য অনেকেরই থাকে না। চাষী চাষ করে তার নিজের অভাব মোচনের চেষ্টায়, সমাজের উপকার করবে এমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করে না। যদি ধান দিয়েই তার সব অভাব মিটত, কিম্বা তার নিজের প্রয়োজনের সব জিনিসই যদি সে নিজেই তৈরি করে নিতে পারত, তবে তার পক্ষে সম্পূর্ণ সমাজনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হত। তার স্বাচ্ছন্দ্যপ্রচেষ্টার মধ্যে একদিকে শ্রমের কষ্ট এবং অন্যদিকে শ্রমের ফলে পরিতৃপ্তি, এ ছাড়া আর কোনো-কিছুরই স্থান থাকত না। কিন্তু, আজকালকার সমাজ শ্রমবিভাগের সমাজ। এমন কেউ আজকাল নেই যে তার নিজের প্রয়োজনের সব জিনিস নিজেই তৈরি করে নেয়, যে কোনো-কিছুর জন্যই অন্য কারো দ্বারস্থ হয় না। চাষীর ধানের ফসল তার অভাব মোচন করে গৌণভাবে— ধানের বদলে কাপড় আসে, ধানের বদলেই আসে তেল নুন ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনের জিনিস। চাষীর অভাবমোচন সম্ভব হয় এইজন্যে যে তার উৎপন্ন ধান অন্য অনেকের প্রয়োজন মেটায় ; তাঁতী ধানের বদলে কাপড় দিতে রাজি, কামার যদি ধান পায় তবে খুশি হয়েই একটা লাঙল তৈরি করে দেবে।

চাষীর' ক্ষেতে যে ধান উৎপন্ন হল তা আরো অনেকের তৃপ্তির কারণ হতে পারে বলেই চাষীর পক্ষে তার নিজের প্রয়োজনের সব জিনিস পাওয়া সম্ভব হয়। একথা সকলের বেলায়ই খাটে। শ্রমবিভাগের সমাজে

জীবিকা অর্জন করতে গেলে অন্যের অভাবের তৃপ্তিসাধন করতেই হবে। একের ব্যয় থেকেই অন্যের আয়ের উৎপত্তি, এবং ব্যয় লোকে করে তখনই যখন তার কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস সে পায়। আমি যদি আয় করতে চাই তবে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে অন্যে ব্যয় করে, অর্থাৎ আমার দেওয়া জিনিস বা আমার করা কাজ মূল্য দিয়ে কিনে নেয়। সেটা সম্ভব হবে যদি আমি আমার শ্রম দিয়ে, আমার কাজ দিয়ে, আমার উৎপন্ন জিনিস দিয়ে তাদের কোনোরকমের তৃপ্তি-বিধান করতে পারি।

অনেককাল আগে যখন শ্রমবিভাগ এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না, তখন অনেকেই নিজেদের প্রয়োজনের অধিকাংশ জিনিস নিজেরাই উৎপন্ন করে নিত, কিম্বা ছোট সমাজ বা গোষ্ঠী গঠন করে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করত। গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো একটা সরল শ্রেণীবিভাগ থাকত এবং যেটুকু আদানপ্রদানের প্রয়োজন হত সেটা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ক্রমে সমাজের প্রসার বাড়ল, আদানপ্রদানের জটিলতা বেড়ে গেল, শ্রমবিভাগ আগের চেয়ে অনেক বিস্তৃত হয়ে এল এবং জিনিসের বদলে জিনিস বিনিময়ের অসুবিধা দূর করতে গিয়ে অর্থের আবিষ্কার হল। অর্থ জিনিসের মূল্যের পরিমাণ করে এবং প্রত্যেক বিনিময়ে মধ্যস্থতা করে; অর্থের প্রচলনে বিনিময়ের কাজে ধাপের সংখ্যা বাড়ল, কিন্তু মোট কাজটা সহজ হয়ে গেল অনেক। যে সমাজে অর্থ ছিল না, সেখানে চাষীর যদি লাঙল দরকার হত তবে তাকে এমন একজন কামারের খোঁজে বেরতে হত যে ঠিক সেই সময়ে লাঙল দিতে রাজি এবং ধান নিতে রাজি। তা ছাড়া আরো অনেক অসুবিধা ছিল। একটা গরুর বদলে যদি দশ মণ ধান পাওয়া যায় তবে যার গরু আছে সে এক মণ ধানের বদলে কি দেবে? বেগুন চাষ করে চাষী যদি

দেখে তার হাতে উদ্বৃত্ত পাঁচ সের বেগুন রয়ে গেছে তবে সেটাকে সে আগামী বছরের জন্য রাখে কি করে? অজন্মার বছরে প্রতিবেশীকে যদি পাঁচ সের ধান ধার দেওয়া যায় তবে পরের বছরের অজস্র ফসল থেকে কতটুকু পেলে সে ধার ন্যায়সংগত ভাবে শোধ হয়?

এমন অনেক অসুবিধার মধ্যে মানুষকে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। তার পরে যখন অর্থের প্রচলন হল তখন এসব অসুবিধার অনেকগুলিই অপসৃত হল। চাষীকে এখন আর সোজা কামারের খোঁজে বেরতে হয় না, বাজারে ধান বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়েই লাঙল কেনা চলে। এক মণ ধান পেতে হলে গরুটাকে বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তার এক-দশমাংশ সহজেই দেওয়া যাবে। পাঁচ সের বেগুন উদ্বৃত্ত থাকলে সেটাকে জমিয়ে না রেখে বেগুন বিক্রির টাকাটা জমানো অনেক সহজ। পাঁচ টাকা ধার নিয়ে পাঁচ টাকা ফেরত দিলে গরমিল বেশি হবে না, কারণ অন্য জিনিসের চেয়ে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয় অনেক কম।

অর্থের প্রচলনের পর থেকে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টারও পরিবর্তন এসেছে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টায় নানারকম দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা আর কাউকে করতে হয় না; কোনো উপায়ে একটা আর্থিক আয় সৃজন করতে পারলেই আর চিন্তা থাকে না। শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া যায় অর্থ, অর্থের বিনিময়ে অন্যের শ্রমের ফল নিজের হাতে আসে। মূলতঃ আগে যা ছিল তাই রয়ে গেলেও, কাজের ক্ষেত্রে অনেকটা রূপান্তর এসে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাও বেড়েছে বিস্তর।

আধুনিক মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যলাভের চেষ্টার প্রধানতঃ দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ নিজের শ্রম বা বুদ্ধি বা উভয়ের বিনিময়ে একটা আর্থিক আয় সৃজন করতে হবে: প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে যাতে এই আয়টাকে যথাসম্ভব

বাড়ানো যায়। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক আয়কে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত করতে হবে ব্যয়ের ভিতর দিয়ে; এই ব্যয় এমন ভাবে করতে হবে যাতে যথাসম্ভব বেশি পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। ব্যয়ের পথ অনেক এবং যতই আমরা উৎপাদন বাড়াতে থাকব, ব্যয়ের পন্থাও ততই আরো এবং আরো বহু-মুখী হতে থাকবে। যদি আমাদের আয় অসীম হত তবে প্রত্যেক জিনিসই আমরা যত খুশি ব্যবহার করতে পারতাম; পরিতৃপ্তিকে পূর্ণতম করে তুলতে পারতাম অনায়াসে। অসীম আয় কারো নেই; অধিকাংশ লোকের আয়ই অল্প, অত্যন্ত অল্প। একদিকে এই অল্প আয় এবং অন্যদিকে অসংখ্য ব্যয়ের পন্থা, এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে কি ভাবে ব্যয়ের বণ্টন করলে পরিতৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বহুলতম করা যেতে পারে এ সমস্যা প্রত্যেকের জীবনে দিনের পর দিন নূতন করে দেখা দিচ্ছে।

আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে অনেক কিছু আমরা পেতে চাই, করতে চাই, কিন্তু উপায়ের সংখ্যা কম। অনেক জিনিস কিনে আমাদের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে চাই, কিন্তু যা দিয়ে কিনব তার পরিমাণ অল্প। হয়তো অনেক জিনিস আমরা উৎপন্ন করতে চাই, কিন্তু যা দিয়ে জিনিস তৈরি হয় তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। জিনিস কিনতে গেলে আয় থাকা দরকার। আয় কারোই অসীম নয়, তাই একটা জিনিস কিনলে আর একটা কেনা হয় না; তখন ভাবতে হয় কোন্‌টা কিনি আর কোন্‌টা ছাড়ি। জিনিস তৈরি করতে গেলে দরকার জমি, কাঁচামাল, কয়লা, শ্রম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এর কোনোটাই অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, এবং সেইজন্যেই একটা জিনিস তৈরি করতে গেলে আর একটার অভাব থেকে যায়। যে জমিতে ধান হয় সেখানে পাটও বোনা যায়; এত জমি আমাদের নেই যে পাট ও ধান দুই-ই যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারি, তাই পাটের চাষ বাড়াতে গেলে ধানের ঘাটতি পড়ে যায়।

যে লোহা দিয়ে কামান বন্দুক হয় তাই দিয়েই কড়িবরগা, রেল লাইন, পেরেক, সেফটি পিন সব তৈরি হয়; যুদ্ধের অস্ত্র নির্মাণে যদি বেশি লোহা লাগে তবে ততটা লোহার ঘাটতি পড়ে অন্যদিকে—কামান বন্দুকের চাহিদা বাড়লে সেফটি পিনের দাম বাড়ে। এরোপ্লেন চালাতে গিয়ে অনেক পেট্রল যদি লেগে যায় তবে কলকাতার রাস্তায় মোটরগাড়ির সংখ্যা কমতে বাধ্য। ভোগের পন্থা অনেক, উপায় কম; উৎপাদনের পন্থাও অজস্র, কিন্তু যা দিয়ে উৎপাদন করা যেতে পারে তার কোনোটাই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

ধনবিজ্ঞানের মূল সমস্যার উৎপত্তি এইখানে। মানুষের বৈষয়িক জীবনের উদ্দেশ্য তৃপ্তিলাভ, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ, সহজ ভাষায় আরামে থাকা। ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেরই এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করতে হয়—কি করে ব্যয়ের অর্থাৎ তৃপ্তিলাভের বহু পথের সঙ্গে নিজের স্বল্প আয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কোন্ জিনিসটা কিনতেই হবে, কোন্‌টা ছাড়লেও চলে, যেগুলি কিনতে হবে তার কোন্‌টা কতখানি পেলে সীমাবদ্ধ আয় থেকে বহুলতম পরিতৃপ্তি পাওয়া যাবে।

যে সমস্যা ব্যক্তির সে সমস্যা সমাজেরও। সমাজের দিক থেকে আমাদের সমস্যা, ধন উৎপাদনের বহু পথের মধ্যে সীমাবদ্ধ পরিমাণে প্রাপ্তব্য উপাদানগুলি কি ভাবে বণ্টিত হলে সব চেয়ে বেশি উপকার হয়। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে একটা সুবিধা এই যে প্রত্যেকে তার নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী ব্যয়ের বা তৃপ্তির পথ বেছে নিতে পারে। সমাজের বেলা সে কথা বলা চলে না। যে 'আণব' সমাজে আমরা বাস করি, সে সমাজ ব্যক্তিনামধারী অসংখ্য অণুর সমষ্টি মাত্র; অসংখ্য ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধির চালনায় যা হয়ে ওঠে তাই সমাজের অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকের বুদ্ধির গরিষ্ঠতম গুণনীয়ক খুঁজে বার করে যদি সে বুদ্ধি দিয়ে সমাজ

চালানো সম্ভব হ'ত তবে সমস্যা সমাধানের অন্ততঃ একটা সুনির্দিষ্ট পথ পাওয়া যেত। আমাদের বর্তমান সমাজে প্রত্যেকে তার নিজের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত— সবসুদ্ধ যেটা গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় সেটা কারো পূর্বচিন্তিত নয়, সেটাকে একটা আকস্মিক যোগফল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এককালে অর্থনীতিবিদ্‌রা বলতেন, অসংখ্য লোকের স্বার্থচিন্তার ফলে সমগ্রভাবে যা হয়ে দাঁড়ায় সেটা সকলের স্বার্থেরই অনুকূল। গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় সে বিশ্বাস অবশ্য ভেঙে গেছে। আমরা আজকাল বুঝি যে ব্যক্তিবিশেষ তার নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টায় অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু তার ফলে সমাজের প্রভূততম উপকার হবে কি না সেকথা কেউ বলতে পারে না। তবু, এখন পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তির অনুসৃত পথের লব্ধফলই সমাজেব পথের ধারা এঁকে দেয়; ভাল হোক, মন্দ হোক, জিনিসটা শেষ পর্যন্ত কি গিয়ে দাঁড়ায় সেটা বুঝতে চেষ্টা করাই ধন-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বাচ্ছন্দ্যপ্রচেষ্টার আলোচনায় 'বিজ্ঞান' কথাটার ব্যবহারে আপত্তি উঠতে পারে। অনেকেরই ধারণা আছে যে পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা চর্চা করা হয় তারই নাম বিজ্ঞান, এবং সে ধারণা অনুসারে আমাদের ধনস্বল্পতার পর্যালোচনাকে বিজ্ঞান বলা নিশ্চয়ই চলে না। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি জানেন যে বিজ্ঞান কোনো বিষয়ের নাম নয়; একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করলে সবক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। কোনো জিনিসকে মাটি থেকে তুলে ছেড়ে দিলে সেটা পড়ে যাবে এটা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, জিনিসের দাম কমে গেলে লোকে সেটা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কিনবে এটাও তেমনি বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রথমটার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত কয়েকটি

মৌলিক সামঞ্জস্যের মধ্যে। দ্বিতীয়টির কারণ খুঁজতে হবে মানবপ্রকৃতির অনেক বিভিন্নতার মাঝখানেও যে মূল একত্বটুকু আছে তার মধ্যে। মানব-প্রকৃতির সহস্ররূপের মধ্যেও কয়েকটি সহজ সামঞ্জস্য খুঁজলেই ধরা পড়ে এবং সেগুলিকে ভিত্তি করেই আমরা বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে পারি। একটা জিনিস বেশি বেশি ব্যবহার করলে সেটার জন্য আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, দাম কম-বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তন হয়, চাহিদা ও যোগান সমান হলে জিনিসের দাম স্থির থাকে এগুলির প্রত্যেকটিই সহজ, সরল বৈজ্ঞানিক সত্য, কার্য ও কারণের মধ্যে যুক্তিসংগত সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য একথা বলা যায় যে পদার্থবিজ্ঞানে বা রসায়নে যে কার্যকারণ-সম্বন্ধগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি অবিচ্ছেদ্য, সর্বত্র প্রযোজ্য এবং সঠিকভাবে পরিমেয়। জড়বিজ্ঞানের নিয়মে ব্যতিক্রম নেই এবং অনেক সিদ্ধান্ত ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ডে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা যায়। ধনবিজ্ঞানে ততখানি নির্ভুলতা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, আর একথাও আমরা বলতে পারি না যে বাজারের নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম নেই। দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এটা ধনবিজ্ঞানের একটা মূলসূত্র। কিন্তু এমনও হতে পারে যে একটা জিনিসের দাম কমল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার আয় কমে গেল; সেক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ে কি না সন্দেহ। কিম্বা যে জিনিসটার দাম কমেছে সেটা হয়তো আগে ফ্যাশনে ছিল, এখন নতুন ফ্যাশনের জিনিস বাজারে আসাতে পুরানো জিনিসটা কম দামেও লোকে কিনবে না। ফাউণ্টেন পেনের কালির দাম কমলেও তার বিক্রি বাড়বে না যদি ইতিমধ্যে কলমের দাম বেড়ে থাকে। মাছের দাম এক টাকা থেকে বারো আনা হলেও চাহিদা না বাড়তে পারে যদি সেদিনই মাংসের দাম পাঁচ সিকা থেকে দশ আনায় গিয়ে দাঁড়ায়।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি একেবারে অবিচ্ছেন্দ্য নয় বা সেগুলির ঠিক পরিমাপ অসম্ভব। তেতলার ছাদ থেকে একটা মারবেল আস্তে ছেড়ে দিলে এক সেকেণ্ডে সেটা কতদূর নীচে যাবে তা প্রাথমিক বিজ্ঞানের ছাত্র আধমিনিটে বলে দিতে পারে। ঘড়ির দাম শতকরা পঁচিশ টাকা কমে গেলে কয়টি ঘড়ি বেশি বিক্রি হবে সেটা অঙ্ক কষে কেউ বার করতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে একথা প্রমাণ হয় না যে ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতাই যদি বিজ্ঞানের একমাত্র পরিচয় হত তবে জীববিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্র আবহতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিকে বিজ্ঞানের পর্যায় থেকে দূরে রাখতে হত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো সিদ্ধান্ত ষোল আনা নির্ভুল একথা জোর করে বলা অসম্ভব। জোয়ার-ভাঁটার মূল কারণগুলি আমরা জানি, পূর্ণিমা-অমাবস্যার সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটার কার্যকারণ-সম্বন্ধও বার করতে পারি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সব সময়ে দুই আর দুইয়ে চার হয় না। আর, আজকাল পদার্থবিজ্ঞানেও সন্দেহ ঢুকেছে—যে মাধ্যাকর্ষণ, যে সরল জ্যামিতি এতদিন নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া হয়েছে তাতে আজকালকার বৈজ্ঞানিক ফাঁক খুঁজে বার করেছেন। স্থানকালপাত্র ভেদে শুধু যে ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তা নয়; স্থান ও কালকে বহুদূর প্রসারিত করে দেখলে ইউক্লিডের সরলরেখা বঙ্কিম হয়ে যায়, মাধ্যাকর্ষণ সংকীর্ণ স্তরে নেমে আসে, অবিচ্ছিন্ন সাবলীল গতিচ্ছন্দে কোয়াণ্টমের তালভঙ্গ দেখা দেয়।

আসল কথা, বিজ্ঞানের পরিচয় সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতায় নয়, বিজ্ঞানের পরিচয় সিদ্ধান্তের প্রকৃতিতে, সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পন্থায়, আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে। যেখানে সম্পূর্ণরূপে সত্য কোনো তথ্য পাওয়া গেল, সেখানে অবশ্য বৈজ্ঞানিকের পূর্ণ সার্থকতা; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সার্থকতা লাভ হয়ে ওঠে না। যা হয়ে উঠতে পারে সেটা হল সত্যের দিকে অগ্রগতি। সেই অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট পন্থা আছে এবং সেই পন্থা অবলম্বন করে আলোচনা যেখানে সম্ভব সেখানেই বিজ্ঞান।

ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে ষোল আনা বিশুদ্ধতার অভাব কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ। বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হয় আরোহী পদ্ধতিতে— অনেকগুলি আলাদা উদাহরণ দেখে সাধারণ নিয়মে উপনীত হবার কয়েকটি উপায় আছে। লজিকের ছাত্রদের শেখানো হয় যে, সব মানুষই মরবে এ সিদ্ধান্তে আসতে গেলে প্রত্যেক লোকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট সংখ্যক উদাহরণ ভালো করে দেখলে এবং যাচাই করে নিলেই সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষা, এই দুটি হল তত্ত্বসন্ধানীর পাথেয়। বৈজ্ঞানিক প্রথমে প্রত্যক্ষ থেকে অনুমান করেন এবং পরে সেই অনুমানকে পরীক্ষা করে, যাচাই করে শেষ সিদ্ধান্তে আসেন। ঠিক এই জায়গায়ই ধনবিজ্ঞানে একটু খুঁত থেকে যায়। রাসায়নিকের মত বীক্ষণাগারে গিয়ে অনুমানকে যাচাই করে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিরাট পৃথিবী এবং অসংখ্য মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ধনবিজ্ঞানের নিয়মের কার্যক্ষেত্র— সে নিয়ম আবিষ্কারে অভিজ্ঞতার স্থান আছে, পরীক্ষার স্থান নেই বললেই হয়। মাধ্যাকর্ষণের অনুমানকে পরীক্ষা দিয়ে যাচাই করে নেওয়া নিউটনের পক্ষে সম্ভব ছিল; চাহিদার সাধারণ নিয়ম যাচাই করতে গিয়ে দোকানদারকে দাম কমাতে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধনবিজ্ঞান এবং অন্য সব সমাজবিজ্ঞানই নিরীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং সেজন্যই ষোল আনা নির্ভুলতা আমরা হাজার চেষ্টা করলেও পাই না। আমাদের দেখাতে অনেক সময় ভুল এবং

ফাঁক থেকে যায়। যতকিছু দেখে নেওয়া উচিত তার সব আমাদের চোখে নাও পড়তে পারে ; যা দেখলাম তার ঠিক স্বরূপটি আমরা যথাসময়ে না-বুঝতে পারি। জ্ঞাত কারণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত কারণ মিশে থাকতে পারে এবং যে ক্ষেত্রে অজ্ঞাত কারণের সংখ্যা বেশি সে ক্ষেত্রে সাবধানে কথা বলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

কিন্তু, এ থেকে একথা বলা চলে না যে ধনবিজ্ঞানের নিয়মের কোনো মূল্য নেই। অধিকাংশের বেলা যে নিয়ম খাটে সমাজে সে নিয়মের মূল্য অনেকখানি। আমরা সবাই প্রায় সাধারণ মানুষ— আমরা প্রায় একই কারণে আনন্দ পাই এবং দুঃখ পাই, আমাদের কার্যধারাও প্রায় একরকমেব। অধিকাংশের বেলা যে নিয়ম প্রযোজ্য, সে নিয়মকে অতিক্রম করা আমাদের কারো পক্ষেই সহজ নয়। বিশেষ কারণ থাকলেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে ; নিয়মটাকে যদি আমরা জেনে রাখি এবং যদি যত্ন নিয়ে জানবার চেষ্টা করি ঠিক কোন্ কোন্ বিশেষ কারণে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তবে আমাদের উপলব্ধিকে সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যের পর্যায়ে আমরা অনায়াসে আনতে পারি।

ধনবিজ্ঞানচর্চায় স্থান কাল পাত্র ও পরিবেশের গুরুত্ব-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলে রাখা দরকার। মানুষের সামাজিক জীবনে অনেকগুলি দিক আছে— ধনবিজ্ঞানের চর্চায় এর মধ্যে মাত্র একটি দিককে আমরা আলাদা করে নিয়ে দেখি। কিন্তু একথা ভুললে চলে না যে আর্থিক রাষ্ট্রীয় নৈতিক ইত্যাদি সব রকম প্রচেষ্টাকে নিয়েই মানুষের জীবন। ধনবিজ্ঞান মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করে একদিক দিয়ে, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান সে চেষ্টা করে অন্যদিক দিয়ে। এইজন্যেই শুধু ধনবিজ্ঞান আলোচনা করেই মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এমন অনেক জিনিস আছে যা একদিক দিয়ে

সমর্থন করা যায় কিন্তু আর একদিক দিয়ে দেখলে যায় না। এক দেশ যদি সস্তায় কোনো জিনিস তৈরি করতে পারে এবং অন্য কোনো দেশে যদি সেটার চাহিদা থাকে তবে প্রথম দেশ থেকে জিনিসটা দ্বিতীয় দেশে চালান দিলে দুই দেশেরই লাভ। এদিক দিয়ে দেখলে ভারতবর্ষ থেকে চীনে আফিম চালান দেওয়া উচিত। কিন্তু সমাজতত্ত্বেরই আর এক দিক থেকে দেখলে আফিম চালান দিয়ে চীনের সর্বনাশ করার সমর্থন অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের উচিত কি সেটা ঠিক করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে আর্থিক লাভই মানুষের বা জাতির সবচেয়ে বড় আদর্শ নয়, যদিও কার্যকরী আদর্শ হিসাবে এটাই সমাজে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। আর্থিক লাভের লোভ মানুষের জীবনে সবচেয়ে কার্যকরী এটা সত্য; এবং এটা সত্য বলেই এই লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যা যা করে তা বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত। এ সত্যকে আমরা স্বীকার করে নেব, কিন্তু আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে মনে কোনো গর্ব পোষণ করব না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি সত্যিসত্যিই মানুষের অর্থপ্রচেষ্টা বা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রচেষ্টাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করতে হয় তবে বিশেষ কোনো সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন করা চলবে না। বর্তমানে যুগের সমাজব্যবস্থার নাম ক্যাপিট্যালিজম বা ধনিকতন্ত্র এবং এর প্রধান রূপ ধনিকের প্রাধান্য, ব্যক্তিস্বার্থের পারস্পরিক সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অসাম্য। সমাজের বিবর্তনে ধনিকতন্ত্র একটা অধ্যায় মাত্র। জমিদার-প্রধান সমাজ যন্ত্রসভ্যতার চাপে ধনিকপ্রধান সমাজে পরিণত হতে বাধ্য; কিন্তু এই ধনিকপ্রধান সমাজই ইতিহাসের শেষ নয়, বা বিবর্তনের পথে উচ্চতম শিখর নয়। ক্যাপিট্যালিজম যতদিন আছে ততদিন তাকে অস্বীকার করা চলে না; সুতরাং এই ধনিকপ্রধান সমাজে মানুষের আচরণ

কি রকম, কোথায় তাদের কর্মের উৎস, কোন্ দিকে তারা চলে, তাদের কর্মধারার নিশ্চয় ফল কি, এসবই আমাদের আলোচনার বিষয় হবে। কিন্তু আলোচনার মধ্যে যাতে পক্ষপাত না ঢোকে সে বিষয়ে ধনবিজ্ঞানীর সাবধান থাকতে হয়। গণিতবিদের পক্ষে যতটা সমাজনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব, ধনবিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধানীর পক্ষে ততটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়; কিন্তু পক্ষপাত বা বিশেষ কোনো সমাজব্যবস্থাকে সমর্থনের চেষ্টাকে দূরে রাখা সকলের পক্ষেই সম্ভব হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের কাজ বুঝতে শেখা এবং বোঝানো, কোনো-কিছুকে দাঁড় করাবার চেষ্টা উকিলের কাজ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

অভাব ও চাহিদা

কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে একটা শ্রেণীবিভাগ করে নিলে সুবিধা হবার সম্ভাবনা। ধনবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুকে আমরা চারটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারি। প্রথম, জিনিসের ব্যবহার বা ভোগ এবং তা থেকে চাহিদার উৎপত্তি; দ্বিতীয়, জিনিসের সরবরাহ; তৃতীয়, বিনিময় ও মূল্যনিরূপণ, অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া; এবং চতুর্থ, উৎপন্ন ধনের বণ্টন। একথা অবশ্য এখনো কেউ জোর করে বলতে পারে না যে আমরা এমন স্তরে এসে পৌঁছেছি যেখানে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। জ্ঞানচর্চায় সর্বদাই নূতন মতবাদ পুরাতনকে স্থানচ্যুত করে; ধনবিজ্ঞানেও যে তাই হবে তাতে আশ্চর্য নেই। কিন্তু তবু সমস্ত তর্কবিতর্কের মধ্য থেকেও

যদি কয়েকটি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত বার করে নেওয়া যায়, তাহলে সেগুলিকে আমরা ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্র বলতে পারি। এই অধ্যায়ে এবং পরের তিনটি অধ্যায়ে আমরা সেই মূলসূত্রগুলির আবিষ্কারের চেষ্টা করব।

আমরা ব্যবহার করি নানা জিনিস। কোনোটা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের, কোনোটা হয়তো নেহাত শখের; কোনোটা ব্যবহার করি দীর্ঘকাল ধরে, যেমন ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, বাড়ি, আসবাব; আবার কোনোটা একবার ব্যবহারেই কার্যকারিতা হারায়, যেমন খাদ্য এবং পানীয়। যে-কোনো জিনিসের ব্যবহার বা ভোগের উদ্দেশ্য হল তৃপ্তিলাভ এবং এর মূলে রয়েছে অভাববোধ। অভাববোধ থেকে কর্মপ্রচেষ্টা আসে, কর্মপ্রচেষ্টা সফল হলে আসে পরিতৃপ্তি; তার পরে আবার নূতন অভাব জেগে ওঠে এবং নূতন করে কাজে নামতে হয়। এমনি করে আর্থিক জীবনের চাকা গড়িয়ে চলে।

আমাদের অভাবের অন্ত নেই। হয়তো আদিমযুগে ক্ষুধা তৃষ্ণা আবরণ ও আশ্রয় এই কয়টি অভাবই মানুষকে কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণা দিয়েছে। ক্রমে সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বেড়েছে, নূতন জিনিস, নূতন ভোগ্য, পুরানো জিনিসের রকমফের, অনেক কিছুই মানুষের প্রয়োজন হয়েছে। আজ আর মানুষের অভাবের সম্পূর্ণ তালিকা কেউ করে উঠতে পারবে না; আমরা যা যা চাই বলে মনে করি তার সবও যদি কেউ আমাদের এনে দেয় তখন দেখব নূতনতর অভাব আমাদের মনে দেখা দিয়েছে। মানুষের অভাবের প্রথম বিশেষত্ব অভাবের সংখ্যার অসীমত্ব।

সব অভাব কিন্তু ঠিক এক জাতের নয়। বাঙালীর জীবনে ভাতের অভাব, গরম কাপড়ের অভাব আর সিল্কের রুমালের অভাব তিন স্তরের

জিনিস। ভাত না হলে বাঙালী জীবনধারণ অসম্ভব মনে করে, যেমন করেই হোক সে অভাব মেটাতেই হবে। গরম কাপড় না হলেও বাংলা দেশের মৃদু শীতে চলে যেতে পারে, তবে পেলে আরাম সন্দেহ নেই। আর সিল্কের রুমাল ব্যবহার করে আরাম যতটা, লোক-দেখানোর সুখ বোধ হয় তার চেয়েও বেশি। যেসব জিনিস দিয়ে অভাবমোচন সম্ভব হয় সেগুলিকে 'প্রয়োজনীয়', 'আরামপ্রদ' ও 'শৌখিন' মোটামুটি এই তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যার আয় অল্প সে প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের ব্যবস্থা করে পরে অন্য জিনিস কিনবার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনীয় জিনিস বলতে প্রধানতঃ আমরা বুঝব সেই সব জিনিস যা ছাড়া জীবনধারণই অসম্ভব; যেগুলি পুষ্টির জন্য প্রয়োজন সেগুলিকেও ক্ষেত্রবিশেষে আমরা ধরে নিতে পারি। কখনো দেখা যায় অনেক জিনিস জীবনধারণ বা পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন নয়, তবু সেটার ব্যবহার অপরিহার্য; যেমন ধূমপায়ীর কাছে সিগারেট অভ্যাসের জোরে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিম্বা দেশাচারের অনুশাসনে ব্রাহ্মণকে উপবীত ব্যবহার করতেই হয়। এমন 'আচারগত প্রয়োজনের' জিনিসও আমাদের রোজকার জীবনে অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে।

অভাববোধের আরো কয়েকটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো অভাব এমন যে একটি জিনিস ব্যবহারে সে অভাব মেটে না, একসঙ্গে দুটি বা তিনটি বা তারও বেশি জিনিসের ব্যবহারে তৃপ্তিলাভ সম্ভব হয়। চা, চিনি ও দুধ একত্রে নিলেই সকালবেলার উষ্ণ পানীয়ের প্রয়োজন মিটতে পারে, কলম হাতে নিলে কালি চাই, মোটরকার থাকলে পেট্রলের প্রয়োজন, রুটির সঙ্গে চাই মাখন, ইটের সঙ্গে চুন বালি শুরকি। দ্রব্যমূল্য-নিরূপণের ক্ষেত্রে এই বিশেষত্ব বিশেষ করেই লক্ষ্য করতে হয়, কারণ মোটরগাড়ির অভাব হলে পেট্রল অনেকেই কিনবে না, ফাউণ্টেন

পেন সস্তা হলে কালির চাহিদা বাড়বে। পেট্রলকে আমরা মোটরকারের 'অনুপূরক' আখ্যা দিতে পারি। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই অভাব দুটি বা ততোধিক জিনিসের যে-কোনো একটি দিয়ে মেটানো যেতে পারে। সকালবেলা যদি একটা গরম পানীয় ছাড়া আমার না চলে তবে চা বা কফি যে-কোনোটা দিয়েই আমার অভাব মিটতে পারে; যদি কফি সস্তা হয়ে যায় তবে চায়ের চাহিদা কমে যাবার সম্ভাবনা। মাছের সঙ্গে মাংসের, বিদ্যুতের সঙ্গে গ্যাসের, বা টুথপেস্টের সঙ্গে দাঁতনকাঠির এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাবে। কলার আর নেকটাই পরস্পরের 'অনুপূরক'; কিন্তু শার্ট আর পাঞ্জাবি পরস্পরের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। আলুসিদ্ধ না খেয়ে পটলসিদ্ধ খেলে আলু ও পটল প্রতিদ্বন্দ্বী; আলু-পটলের তরকারি রাঁধলে একটি অপরটির অনুপূরক।

যেখানে অভাববোধ সেখানেই অভাবমোচনের চেষ্টা, এবং সে চেষ্টা সফল হলে অভাববিশেষের অবসান ঘটতে পারে। মানুষের সব অভাব নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব, কিন্তু কোনো এক সময়ে বিশেষ একটি অভাবের সম্পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব নয়। আমার সব অভাব কোনোকালেই মিটবে না, কিন্তু আমি যদি বসে বসে আপেল খেতে আরম্ভ করি, বিরামহীনভাবে একটার পর একটা, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন অবস্থা আসবে যে, আমি বলে উঠব, এখনকার মত আমার আপেল খাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছে। অভাবের এই বিশেষত্বটি থেকেই চাহিদার প্রধান নিয়মগুলির উৎপত্তি এবং সেজন্যই এটাকে খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে অন্য দু-একটা ধারণা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

আমাদের ব্যবহৃত প্রত্যেক জিনিসেরই অভাবমোচনের ক্ষমতা বা 'তৃপ্তিদান-ক্ষমতা' আছে; আলো-বাতাস থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনের

আরামের এবং শখের সব জিনিসই আমাদের কম-বেশি মাত্রায় তৃপ্তি দিতে পারে। সে তৃপ্তি উঁচুদরের না নীচুদরের সেটা আমাদের দেখবার কথা নয়— মোটরগাড়ির যেমন তৃপ্তিদান-ক্ষমতা আছে, মদেরও সে ক্ষমতা আছে, অন্ততঃ মাতালের কাছে। এই তৃপ্তিদান-ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে একার্থক মনে করলে ভুল করা হবে। যে জিনিসের তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আছে সে জিনিসই লোকে চায়; তৃপ্তিদান-ক্ষমতা থেকেই জিনিসের 'বাঞ্ছনীয়তা' বা 'কাম্যতা' আসে।

যেসব জিনিসের তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা কাম্যতা আছে স্বাচ্ছন্দ্যবর্ধনে সেগুলির প্রত্যেকটিই সহায়তা করে। এদের মধ্যে যেগুলি আলোবাতাসের মত যথেচ্ছ পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলি নিয়ে সমাজে কোনো সমস্যা ওঠে না। যেগুলির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, যেগুলি মানুষের শ্রমের ফলে পাওয়া যায় এবং যেগুলির হস্তান্তর সম্ভব কেবল সেগুলিই সমস্যার সৃষ্টি করে। আমাদের শাস্ত্রে আমরা 'ধন' কথাটি এই ধরনের জিনিস বোঝাতে ব্যবহার করি— সেই সব জিনিস যাদের তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা কাম্যতা আছে, যাদের পরিমাণ অসীম নয় এবং যেগুলির হস্তান্তর সম্ভব। আলো বাতাস বা জল সাধারণ অবস্থায় ধনের পর্যায়ে পড়বে না। জমি ধান তেল নুন, সোনা, বইয়ের কপিরাইট, দোকানের সুনাম- এর সব জিনিসই কাম্য, সীমাবদ্ধ পরিমাণে প্রাপ্তব্য এবং হস্তান্তরের উপযুক্ত; ধনের সংজ্ঞার মধ্যে এদের সবগুলিই পড়বে।

কোনো জিনিস একবার ব্যবহার করলে তখনকার মত সেটার জন্য কামনার কিছুটা অন্ততঃ উপশম হয়; এবং যদি জিনিসটা ব্যবহার করেই চলতে থাকি তবে কামনা বা অভাববোধও ক্রমেই কমতে থাকবে। জিনিসের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা কাম্যতা ক্ষীণতর হয়ে আসে। শীতের আরম্ভে প্রথম কমলালেবুটি হয়তো আমি চার আনা

দিয়ে কিনে খেয়ে ফেলতে পারি ; কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই যদি লেবু-বিক্রেতা আর একটা লেবু আমাকে বেচতে চায় তখন চার আনা আর আমি দেব না। ছ-সাত মাস লেবু না খেয়ে যে তীব্র অভাববোধ আমার মনে সঞ্চিত হয়ে ছিল, প্রথম লেবুটা খাবার পরে তার অনেকটাই চলে গেছে। হয়তো দু-আনা দিয়ে দ্বিতীয় লেবুটা আমি কিনব এবং তৃতীয়টা এক আনায়, এবং এ থেকেই প্রমাণ হবে যে প্রথম লেবুটি থেকে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, দ্বিতীয়টি থেকে পাব তার চেয়ে কম এবং তৃতীয়টি থেকে আরো কম।

এই তিনটি লেবুর কাম্যতা-হ্রাসে মানবচরিত্রের একটা সাধারণ নিয়মের ক্রিয়া দেখা যায় : আমরা যে জিনিসটা পাই তার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা কমে যায়। যদি তৃপ্তিকে পয়সা দিয়ে মাপা যেত তবে বলা যেত যে আমি এক্ষেত্রে প্রথম লেবু থেকে চার আনার তৃপ্তি, দ্বিতীয়টি থেকে দু-আনার এবং তৃতীয়টা থেকে এক আনার তৃপ্তি পেয়েছি, এবং তিনটি লেবু খাওয়াব ফলে আমার মোট সাত আনার তৃপ্তি লাভ হয়েছে।

তিনটি লেবু খাওয়ার ফলে যে মোট তৃপ্তি আমি পেয়েছি, তাতে তৃতীয়টির অংশ মাত্র এক আনার। এক্ষেত্রে এই তৃতীয় লেবুটি থেকে পাওয়া তৃপ্তিকে আমার 'পার্যন্তিক' বা 'প্রান্তিক' তৃপ্তি বলে অভিহিত করতে পারি এবং বলতে পারি যে এখানে লেবুর 'প্রান্তিক কাম্যতা'র পরিমাপ এক আনা। ধনবিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে এই প্রান্তিক কাম্যতার গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যাবে। যখন আমি মোটে একটা লেবু কিনেছি তখন, পয়সার মাপকাঠিতে, মোট তৃপ্তি চার আনার, এবং যেহেতু প্রথম লেবুটিই এক্ষেত্রেই শেষ, প্রান্তিক কাম্যতার মাপও চার আনা ; যখন দুটি লেবু আমার হাতে এল তখন মোট তৃপ্তি ছয় আনার, এবং দ্বিতীয় লেবুটি এখন 'প্রান্তিক' হওয়াতে, প্রান্তিক কাম্যতার মাপ দু-আনা ; তৃতীয়

লেবুটি যখন আমি পেলাম তখন আমার মোট তৃপ্তি সাত আনায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রান্তিক তৃপ্তি এক আনায়।

একটা জিনিস একটু বেশি ব্যবহার করলে বাড়তি যে তৃপ্তিটুকু পাওয়া যায় সেটাই প্রান্তিক তৃপ্তি বা জিনিসটার প্রান্তিক কাম্যতা। তিনটি লেবু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মোট তৃপ্তি, পয়সার হিসাবে, চার আনা থেকে ছয় আনায় এবং পরে সাত আনায় উঠল; আর প্রান্তিক তৃপ্তি নেমে এল চার আনা থেকে দু-আনায় এবং পরে এক আনায়। আরো একটা লেবু কিনলে মোট তৃপ্তি আবার কিছুটা বাড়বে, কিন্তু প্রান্তিক কাম্যতা আরো নীচে নেমে আসবে। প্রান্তিক কাম্যতা এভাবে কমতেই থাকবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শূন্য বা ঋণাত্মকও হতে পারে। মোট তৃপ্তি বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু বৃদ্ধির হারটা ক্রমেই কমে আসে; সুতরাং কিছুদূর গিয়ে মোট তৃপ্তির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে, এবং প্রান্তিক কাম্যতা ঋণাত্মক হয়ে গেলে মোট তৃপ্তি বর্ধমান হারে কমতে থাকবে।

এই 'প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়ম' ধনবিজ্ঞানের গোড়ার সূত্র। ঠিক ভাবে বুঝলে স্বীকার করতে হবে যে এই নিয়মের কোনো সত্যিকারের ব্যতিক্রম নেই। একই সময়ে একই ব্যক্তি যদি পুনঃপুনঃ একই জিনিস ব্যবহার করে তবে সে জিনিসের প্রান্তিক কাম্যতা কমতে বাধ্য। যে দু-একটি ব্যতিক্রম পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতারা দেখিয়ে থাকেন সেগুলির উদ্ভব বুঝবার ভুলে কিম্বা কষ্টকল্পনায়। টাকার বেলায় এই নিয়মটি খাটে না এটা অনেকেরই ধারণা। কিন্তু একথা সহজেই বোঝা যায় যে টাকা আমরা প্রথমে খরচ করি প্রয়োজনের জিনিস কিনতে, এবং তার পরে আরো টাকা পেলে কম দরকারি জিনিস কিনি। দশটা টাকা থেকে একটা টাকা হারালে যা কষ্ট হয় একশ টাকা থেকে এক টাকা হারালে কষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক কম। অল্প টাকার প্রান্তিক কাম্যতার চেয়ে

বেশি টাকার প্রান্তিক কাম্যতা নিশ্চয়ই কম। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। টাকা ঠিক 'একটা' জিনিস নয়, টাকা সর্বপ্রকার জিনিসের প্রতিনিধি। যদি টাকা দিয়ে কেবল পেনসিল ছাড়া আর কিছু কিনতে না পাওয়া যেত তবে প্রথম টাকাটার পরে দ্বিতীয় টাকার কাম্যতা অনেক কমে যেত। প্রথম টাকা দিয়ে চাল কিনে দ্বিতীয় টাকা দিয়ে মাছ কিনতে পারি বলেই টাকার প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাস আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না।

একটা কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির বেলা আলাদাভাবে কাজ করে। একজনের পাওয়া তৃপ্তির সঙ্গে আর একজনের পাওয়া তৃপ্তির কোনো তুলনা চলে না—পয়সার মাপকাঠিতেও না, কারণ দাম দেবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। আমি যদি লেবু খেয়েই যাই তবে একথা বলা চলে যে চতুর্থ লেবুটির চেয়ে পঞ্চম লেবুটি আমাকে কম তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু আমি যদি চারটি লেবু খাই আর রাম খায় পাঁচটা তাহলে একথা বলা চলে না যে আমি চতুর্থটি থেকে যে তৃপ্তি পেয়েছি, রাম পঞ্চমটি থেকে তার চেয়ে কম পেয়েছে।

এই প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়মটিকে আজকাল কেউ কেউ সহজতর করে আনবার চেষ্টায় আছেন। তৃপ্তি বা কাম্যতাকে সোজাসুজি মাপবার কোনো উপায় নেই—কোন্ জিনিসটার জন্য আমরা কি দাম দিতে রাজি আছি সেটাই মাত্র আমরা দেখতে পাই। অতএব তৃপ্তির হিসাব ছেড়ে দিয়ে একটা জিনিসের কাম্যতাকে আর একটা জিনিসের মাপকাঠিতে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, আমার হাতে পাঁচটা আপেল আর দুটি লেবু আছে। আমি যদি আর দুটো লেবু পেলে একটা আপেল দিয়ে দিতে রাজি হই তবে বলা যায় যে পাঁচটা আপেল ও দুটি লেবু

একত্রে আমার কাছে চারটি আপেল ও চারটি লেবুর সমান। এরকমে তিনটি আপেল ও কয়টি লেবুকে আমি ঠিক পাচটি আপেল ও দুটি লেবুর সমান ধরব সেটাও জেনে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম বারে যখন আমি আরো দুটি লেবু পাবার আশায় পাঁচটি আপেলের একটি ছাড়তে রাজি হলাম তখন দুটি লেবু = একটা আপেল, এই হারকে 'বিনিময়ের প্রান্তিক হার' আখ্যা দিতে পারি। এই হারটা আস্তে আস্তে বদলাতে থাকবে, কারণ দ্বিতীয় বারে দুটি লেবুর চেয়ে বেশি না পেলে আমার চতুর্থ আপেলটি আমি ছাড়তে রাজি হব না।

মোট কথা অবশ্য একই দাঁড়াল। তৃপ্তির দিকে একেবারে না তাকিয়ে যদি কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার বাহ্য আচরণের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় তবে প্রান্তিক কাম্যতার চেয়ে বিনিময়ের প্রান্তিক হার আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি তা এই যে, অল্প জিনিস বাজারে থাকলে আমরা বেশি দামে কিনতে রাজি হব, আর যদি বাজারে জিনিস থাকে অনেক তবে তার প্রান্তিক কাম্যতা বা বিনিময়ের হার নীচে নেমে যাবে এবং কম দামে না পেলে সে জিনিস আমরা কিনব না। পয়সার মাপকাঠিতে কাম্যতা মাপা যায় ধরে নিলে স্বীকার করতে হবে যে শেষ পর্যন্ত জিনিসের দাম প্রান্তিক কাম্যতার সমান হতে বাধ্য। যদি প্রান্তিক কাম্যতা বাজারদরের চেয়ে বেশি হয় তবে জিনিসটা আরো কেনা লাভজনক, এবং তাতেই প্রান্তিক কাম্যতা নেমে আসবে, যতক্ষণ না সেটা দামের সমান গিয়ে দাঁড়ায়। আবার যদি প্রান্তিক কাম্যতা বাজারদরের চেয়ে নীচে হয় তবে ক্রেতা কম করে কিনবে এবং প্রান্তিক কাম্যতা বেড়ে গিয়ে আবার দামের সমান হবে। অবশ্য ক্রেতার পক্ষে এরকম কেনা বাড়ানো বা কমানো সম্ভব তখন যখন অন্য সব জিনিসের দাম ঠিক থাকে এবং যখন তার আয়ের অতি

সামান্য অংশ কোনো একটি জিনিস কিনতে ব্যয়িত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এরকম ধরে নেওয়া যেতে পারে, এবং যে-কোনো ক্ষেত্রেই এটা ঠিক যে, বাজারে প্রাপ্তব্য জিনিসের পরিমাণ যত বেশি হবে, প্রান্তিক কাম্যতা হবে তত কম, এবং ক্রেতাও কম দামে না পেলে জিনিসটা কিনবে না।

এটাকেই 'চাহিদার নিয়ম' নাম দেওয়া যেতে পারে। সহজ কথায় নিয়মটি এই যে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। দামের প্রত্যেক পরিবর্তনের সঙ্গে বিপরীত দিকে চাহিদার পরিবর্তন হবে। 'অবরোহী' পদ্ধতিতে এ নিয়মটি কাম্যতা হ্রাসের নিয়ম থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়; 'আরোহী' পদ্ধতিতে বাজারে গিয়ে কয়েকটা জিনিসেব দামের ওঠানামাব ফলাফল লক্ষ্য করলেই এ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। ফ্যাশন, রুচি, আয়, বাজারের সাধারণ অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান ইত্যাদি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে বাজারদরের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাবেই।

অবশ্য, হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ বা অনুপাত সব ক্ষেত্রে একরকম হবে না। নুনের দাম একটু বাড়লে চাহিদাব বিশেষ হ্রাস অনুভূত হবে না, কিংবা দাম একটু কমলে লোকে বেশি করে নুন খেতে আরম্ভ করবে না। কিন্তু বিদ্যুতের কারেণ্ট যদি সস্তায় পাওয়া যায় তবে লোকে প্রত্যেক কাজে বেশি করে এবং অনেক নূতন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে; কারেণ্টের দাম বাড়লে লোকে ব্যবহার কমাবে এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই অন্য জিনিস দিয়ে কাজ চালাতে আরম্ভ করবে। নুনের দাম দু-আনা থেকে দশ পয়সা হলে চাহিদার যতটা কমতি দেখা যাবে, বৈদ্যুতিক কারেণ্টের দাম সেই পরিমাণ বাড়লে চাহিদার কমতি হবে অনেক বেশি। বিদ্যুৎ এবং নুন, দুটির চাহিদাই পরিবর্তনশীল, কিন্তু পরিবর্তনের অনুপাত বিভিন্ন। এই দুটি উদাহরণকে আলাদা করে দেখতে হলে আমরা বলতে

পারি যে বিদ্যুতের চাহিদা 'অতিপরিবর্তনশীল' এবং নুনের চাহিদা একেবারে অপরিবর্তনশীল না হলেও 'অনতিপরিবর্তনশীল' নিশ্চয়ই।

সুতরাং চাহিদা দু-রকমের— 'অতিপরিবর্তনশীল' ও 'অনতি-পরিবর্তনশীল'। যে জিনিস আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় তার চাহিদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বে; যে জিনিস আমাদের না হলেও চলে, যার পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহার করা চলে, এবং যে জিনিসটা ইচ্ছা করলে কমবেশি রকমের কাজে লাগানো যায় তার চাহিদা হবে 'অতিপরিবর্তন-শীল'। প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রান্তিক কাম্যতা প্রথমটা খুব বেশি, কিন্তু জিনিসটা কিছু পরিমাণে পাওয়া গেলেই প্রান্তিক কাম্যতার হ্রাস হয় খুব দ্রুত। আরামের বা শখের জিনিসের প্রান্তিক কাম্যতা খুব বেশি না হলেও কমে খুব ধীরে ধীরে; সুতরাং দাম একটু কমে গেলেই চাহিদা অনেকটা বাড়বার সম্ভাবনা থাকে।

পরিবর্তনশীলতার মাপকাঠি পাওয়া যাবে মূল্য-পরিবর্তনের অনুপাতের সঙ্গে চাহিদা-পরিবর্তনের অনুপাত তুলনা করলে। দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে যদি চাহিদার এত বৃদ্ধি হয় যে ক্রেতার মোট ব্যয় বেড়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে চাহিদাকে বলব অতিপরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনশীলতা এককের চেয়ে বেশি; যদি দাম কমবার ফলে চাহিদার বৃদ্ধি এত কম হয় যে ক্রেতাদের মোট ব্যয় কমে যায় তবে চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনশীলতা এককের চেয়ে কম; আর দাম কমলে যদি দেখি ক্রেতার মোট ব্যয় বাড়েওনি, কমেওনি, তবে পরিবর্তনশীলতাকে এককের সমান ধরে নেব। চার আনা দামে একশটি জিনিস বিক্রি হলে ক্রেতাদের মোট ব্যয় পঁচিশ টাকা। দাম যদি তিন আনায় নামে আর ফলে চাহিদা বেড়ে হয় একশ কুড়ি তবে ক্রেতাদের মোট ব্যয় ২২৷৷০; চাহিদার পরিবর্তনশীলতা এক্ষেত্রে এককের চেয়ে কম। তিন আনা দামে চাহিদা

যদি ১৫০-এ উঠত তবে ক্রেতাদের মোট ব্যয় হত ২৮৵০ এবং পরিবর্তনশীলতা এককের চেয়ে বেশি। চাহিদা যদি হত ১৩৩ তবে ক্রেতাদের মোট ব্যয় হত ২৪৮৶০, অর্থাৎ আগেকার ব্যয়ের সমানই; এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা এককের সমান ধরে নেওয়া যায়।

মূল্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন চাহিদার পরিবর্তন হয় তেমনি আরো অনেক কারণে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। বিশেষতঃ ক্রেতার আয়ের সঙ্গে চাহিদার একটা মুখ্য সম্বন্ধ আছে। মাছ সস্তা হলে আমি বেশি করে মাছ কিনব; কিন্তু মাছের দাম না কমলেও (বা এমন কি বাড়লেও) আমার মাছের চাহিদা বাড়তে পারে যদি ইতিমধ্যে আমার আয়বৃদ্ধি হয়ে থাকে। মূল্য-পরিবর্তনের অনুপাতের সঙ্গে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি তুলনা করে যেমন আমরা চাহিদার 'মূল্যানুগ পরিবর্তনশীলতা' মাপতে পারি, তেমনি আয়-পরিবর্তনের অনুপাতের সঙ্গে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি তুলনা করে আমরা চাহিদার 'আয়ানুগ পরিবর্তনশীলতা' পরিমাপের চেষ্টা করতে পারি। মূল্য-পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিবর্তন হবে বিপরীতমুখী; আয়-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন হবে সাধারণত একমুখী।

প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়ম থেকেই আর একটি মূলসূত্রে পৌছনো যাবে। আমার হাতে যদি একটা টাকা থাকে এবং সে টাকাটা নিয়ে মাছ আর তরকারি কিনতে আমি বাজারে যাই তবে আমার মনে এই সমস্যাটা উঠবে যে ক'আনার মাছ কিনব আর ক'আনার তরকারি। অতিরিক্ত মাছ কিনে ফেললে সবজি কেনার জন্য বেশি পয়সা থাকবে না; ফলে মাছের প্রান্তিক কাম্যতা হবে কম, আর সবজির প্রান্তিক কাম্যতা বেশি। যদি একটু কম মাছ কিনে আর একটু বেশি তরকারি কিনতাম তবে তৃপ্তি একদিকে যতটা কমত আর একদিকে বাড়ত তার চেয়ে বেশি। যতক্ষণ একটা জিনিসের প্রান্তিক কাম্যতা কম এবং আর

একটা জিনিসের প্রান্তিক কাম্যতা বেশি, ততক্ষণ প্রথমটার ব্যবহার কমিয়ে দ্বিতীয়টার ব্যবহার বাড়ালে মোট তৃপ্তি বাড়বে। কিন্তু প্রথমটার ব্যবহার কমালে সেটার প্রান্তিক কাম্যতা উপরের দিকে উঠবে আর দ্বিতীয় জিনিসটার ব্যবহার বাড়ালে সেটার প্রান্তিক কাম্যতা নেমে আসবে— এবং যতক্ষণ না দুটির প্রান্তিক কাম্যতা সমান হয়ে যায় ততক্ষণ পরিবর্তনের ফলে মোট তৃপ্তি বাড়বে। সুতরাং মোট তৃপ্তি বহুলতম হবে তখন, যখন মাছের প্রান্তিক কাম্যতা ও তরকারির প্রান্তিক কাম্যতা সমান সমান।

দুটি জিনিসের উদাহরণ নিয়ে যা দেখানো হল, তিনটি বা ততোধিক জিনিসের বেলাও তাই খাটে। যতক্ষণ আমাদের আয় বা উপায় সীমাবদ্ধ ততক্ষণ নানা দিকে আয় বা উপায়কে বুদ্ধিমানের মত ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তিকে প্রভূততম করে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং তৃপ্তি প্রভূততম হবে তখনই যখন বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারে সমান সমান প্রান্তিক তৃপ্তি পাওয়া যাবে। এটাকে আমরা 'প্রান্তিক কাম্যতার সমতার নিয়ম' নাম দিতে পারি। জিনিসের ব্যবহারের সব ক্ষেত্রে— ভোগে এবং উৎপাদনে— এই প্রান্তিক কাম্যতার সমতা আসবার দিকে একটা প্রবণতা দেখা যাবেই।

আমরা আগেই দেখেছি জিনিসের দাম নির্ভর করে প্রান্তিক কাম্যতার উপরে, মোট তৃপ্তির উপরে নয় ; এবং প্রান্তিক কাম্যতা সর্বদাই মোট তৃপ্তির চেয়ে কম। সুতরাং যে দামে আমরা জিনিস কিনি সেটা মোট তৃপ্তির পরিমাপ নয় ; কিছুটা 'উদ্বৃত্ত তৃপ্তি' আমরা পেয়ে যাই। জিনিসটা ব্যবহার করতে পারলে একদিকে একটা মোট তৃপ্তি আমাদের পাওনা ; অন্য দিকে দাম দিতে হয় বলে একটা অতৃপ্তিও আছে। ব্যবহারের তৃপ্তি যদি মূল্যদানের অতৃপ্তি থেকে বেশি হয় তবেই একটা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি ভোগ করা

সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহারের তৃপ্তি মূল্যদানের অতৃপ্তি থেকে অনেকটা বেশি, এবং ক্রেতাও তাই খানিকটা উদ্বৃত্ত সুখ পেয়ে থাকে।

একটা সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক। আজকাল দু-আনা দিয়ে আমরা খবরের কাগজ কিনছি; আগে কিনতাম এক আনায় এবং সে কাগজে পৃষ্ঠাসংখ্যাও বেশি থাকত। যে কাগজের জন্য দু-বছর আগে আমরা এক আনা দিয়েছি সে কাগজ এখন আমরা দু-আনা দিয়ে বা তারও বেশি দিয়ে কিনতে রাজি আছি। অতএব যখন এক আনায় কাগজ কিনেছি তখন কিছুটা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি আমাদের ভোগে এসেছে। এখনো বোধ হয় উদ্বৃত্ত একেবারে নির্মূল হয়নি, কারণ দু-আনার বেশি দাম হলেও তো আমরা কাগজ কিনতে পারি। যে জিনিসটা দুষ্প্রাপ্য হলে আমি পাঁচ টাকাও দিতে রাজি হব সেটা যদি বাজারের অবস্থাগুণে আট আনায় পাই তবে আমার ভোগের তৃপ্তি মূল্য দানের অতৃপ্তি থেকে অনেক বেশি; প্রায় বলা যায় যে সাড়ে চার টাকা পরিমাণের উদ্বৃত্ত তৃপ্তি এক্ষেত্রে আমি পেয়েছি। বাজারে সাধারণ অবস্থায় এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা আমরা সস্তায় কিনি, কিন্তু দাম হলেও কিনতাম। দরকার হলে যে জিনিসের জন্য আমি বেশি দাম দিতাম, সে জিনিসটাই যদি কম পয়সায় মেলে তবে আমার স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বাড়ে।

অবশ্য এই তৃপ্তির উদ্বৃত্ত মাপতে গেলে গোলমালে পড়তে হবে। যে দাম দিয়ে জিনিস কিনি সেটা জানি; দরকার হলে যে দাম দিতাম সেটা কে বলে দেবে? অন্য জিনিসের দাম ঠিক থাকলে হয়তো একটা জিনিস বেশি দাম দিয়েও কিনতাম; কিন্তু সব জিনিসেরই অভাব হলে কোন্‌টার জন্য কত দাম দিতাম বলা শক্ত। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব হলে কী দাম আমরা না দেব সেটা বলাই কঠিন। যে জিনিসের বদলি পাওয়া

যায় বা যে জিনিসটা আর একটা অনুপূরক না হলে ব্যবহারই করা যায় না, তার দেওয়া তৃপ্তির মাপ হয় কি করে? আমি হয়তো বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নুনের জন্য এক টাকা পর্যন্ত দেব আর চন্দ্রপুরের মহারাজা বোধ হয় পঞ্চাশ টাকা দিতেও আপত্তি করবেন না; বাজারের অবস্থাগুণে যদি আমরা দু-জনেই দু-আনা দামে নুন কিনি তবে কি উদ্‌বৃত্ত তৃপ্তি আমার কম আর মহারাজার বেশি? প্রান্তিক কাম্যতা দিয়ে মূল্য নির্ণীত হয়, কিন্তু দাম আমরা দিই কি শুধু প্রান্তিক কাম্যতার জন্যই, না মোট তৃপ্তিটা লাভের আশায়? এসব প্রশ্নের কয়েকটার উত্তর দেওয়া চলে, কিন্তু একথা মেনে নেওয়াই ভাল যে উদ্‌বৃত্ত তৃপ্তির ধারণা যত সহজে করা যায়, পরিমাপ তত সহজে করা যায় না। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে বাজারে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ক্রেতার কাছে আয় কমারই নামান্তর; আর আয় কমলে যে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দাম কমলে সেটা পুষিয়ে যেতে পারে।

এক প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়ম থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়ে গেলাম— চাহিদার নিয়ম, চাহিদার পরিবর্তনশীলতা, বহু জিনিসের ব্যবহারে প্রান্তিক কাম্যতার সমতা, এবং সর্বশেষে, মোট তৃপ্তি ও প্রান্তিক তৃপ্তির মধ্যে পার্থক্যজনিত উদ্‌বৃত্ত তৃপ্তি। ব্যবহার ও চাহিদার সাধারণ নিয়ম সব এরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এবারে উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দুটি দিককে এক করে আনতে পারব। জিনিসের ব্যবহার সম্ভব হয় উৎপাদনের ফলে এবং ব্যবহার করা মানেই আরো উৎপাদনের প্রয়োজন সৃষ্টি করা। একটা জিনিস ব্যবহার করলে তার তৃপ্তিদান ক্ষমতা কমে যায়— কোনো ক্ষেত্রে একেবারে, কোনো ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে। ব্যবহার যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তৃপ্তিদান-ক্ষমতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। একটা আম একবার খাওয়া হয়ে গেলেই তার ব্যবহার

সম্পূর্ণ, কারণ আর তার তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা থাকে না। একটা শার্ট ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা চলে যেতে থাকে এবং এক বছর পরে হয়তো দেখা যাবে যে শার্টটা আর ব্যবহার করা যায় না, অর্থাৎ তার তৃপ্তিদানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে; আবার তখন বাজারে ছুটতে হবে নূতন জামার সন্ধানে, নূতন উৎপাদনের জন্য চাহিদা নিয়ে। ব্যবহার মানে কাম্যতাব বিলয়; উৎপাদনের উদ্দেশ্য কাম্যতা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতার সৃজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উৎপাদন ও সরবরাহ

উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সৃজন করে ভোগ বা ব্যবহার সম্ভব করা। নূতন জিনিস বা পদার্থ সৃষ্টি কেউ করতে পারে না— যা করতে পারে তা হল পুরানো জিনিসের নূতন রূপ দিয়ে সেটাকে ভোগ্য বা ব্যবহার্য করে তোলা। যে কাঠ আর লোহা পৃথিবীতে আছে তাকে টেবিলের বা রেল-লাইনের রূপ দিলে যে কাজ আগে করা যেত না তা করা সম্ভব হবে। এই নূতন কাম্যতা সৃজনের নামই উৎপাদন।

জিনিসের রূপ বা আকার বদলানো ছাড়া অন্য উপায়েও কাম্যতা সৃজন সম্ভব হতে পারে। রেল-কোম্পানি রানীগঞ্জ থেকে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসে এবং কয়লার স্থান পরিবর্তন করেই তার অভাবমোচনের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়; রানীগঞ্জের কয়লা কলকাতার লোককে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা অর্জন করে। দোকানদার অগ্রহায়ণ মাসে চাল কিনে রেখে যদি সে চাল চৈত্র মাসে বিক্রি করে তবে সেও কাম্যতা সৃষ্টি করে, কারণ অগ্রহায়ণ

মাসের চালকে চৈত্র মাসে না আনতে পারলে চৈত্র মাসের অভাব মিটবে না। কাম্যতা 'আকারগত', 'স্থানগত' ও 'কালগত' হতে পারে, এবং এর যে-কোনো রকমের কাম্যতা সৃজনকেই আমরা উৎপাদন বলতে পারি। আবার জিনিসে হাত না দিয়েও কাম্যতা সৃজন করা যায়। যে গায়ক গান গেয়ে আমাদের তৃপ্তি দেয় সেও উৎপাদক; তার গান শোনা হয়তো বহুলোকের কাম্য এবং পয়সা দিয়েই তারা গান শোনে। উকিল ডাক্তার বিচারক অভিনেতা মাস্টার এদের কেউই স্পর্শনীয় জিনিস তৈরি করে না; কিন্তু এরা সকলেই কাম্যতা সৃজন করে, এমন তৃপ্তি দেয় যার জন্য লোকে দাম দিতে রাজি আছে। কামার কুমার তাঁতী চাষী রেল-কোম্পানি বা দোকানদারের মত এদেরও উৎপাদকের পর্যায়ে ফেলতে হবে। চোর বা গাঁটকাটা উৎপাদক নয়, কারণ তাদের শ্রমের ফল সমাজের পক্ষে কাম্য নয়; গাঁটকাটার কাজের জন্য যদি খোলা বাজারে মূল্য জুটত তবেই তাকে আমরা সমাজের চোখে উৎপাদক বলতে পারতাম।

উৎপাদনের প্রধান 'উপাদান' তিনটি—জমি ও প্রকৃতিদত্ত অন্যান্য সম্পদ, মানুষের শ্রম এবং সঞ্চিত মূলধন। এই তিনটির সংযোগ না হলে কোনো উৎপাদনই আজকাল সম্ভব নয়। যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে আয়তন বড় হয়ে এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগের গুরুত্ব বেড়েছে। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিও আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি। উৎপাদনের জন্য কি কি আবশ্যক তার তালিকা করলে 'জমি', 'শ্রম' ও 'মূলধনের' সঙ্গে 'সংযোগ-নৈপুণ্য' এবং 'অনিশ্চয়তাবহন'কেও ধরে নিতে হয়।

কৃষিকার্যে জমির গুরুত্ব যতটা অন্য উপাদানের ততটা নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু খানিকটা জমি বা প্রকৃতিগত সম্পদ সব উৎপাদনেই প্রয়োজন।

কৃষিকার্যে জমির উৎপাদিকাশক্তির ক্রমিক হ্রাস লক্ষ্য করে ওয়েস্ট এবং রিকার্ডো উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। আজকাল আমরা দেখি যে উৎপাদন-হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের মধ্যেই জমির বিশেষ নিয়মটিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়; সুতরাং জমির উর্বরাশক্তির হ্রাসকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য বলে মেনে নিয়ে উৎপাদনের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা যথাস্থানে করব। জমির আরো কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। জমিকে স্থানান্তরে নেওয়া যায় না, এবং সেজন্যই কলকাতায় যে দামে জমি বিক্রি হয় তার একটা ছোট ভগ্নাংশ দিয়েই কলকাতার পাঁচ মাইল দূরে জমি কেনা যায়। দুটি কলম, দুটি ছাতা বা দুটি মোটরকার ঠিক একরকম হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু দুটি জমি ঠিক একরকম কখনো হয় না— কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে তাদের পার্থক্য থাকবেই। সর্বোপরি, জমির মোট পরিমাণ সীমাবদ্ধ— যে দেশে ব্যবহার্য সব জমিই ব্যবহারে এসেছে সে দেশে জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না এবং কমিয়ে লাভ নেই। অবশ্য প্রয়োজন হলে পাটের জমিতে ধান চাষ ক'রে ধানের জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, এবং মোট জমির দিক দিয়ে দেখলে পরিমাণের সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রকৃতিদত্ত সম্পদের উপরে মানুষের শ্রম প্রযুক্ত হয় মূলধনের সহায়তায়। শ্রমের কার্যকারিতা নির্ভর করে শ্রমিকের দক্ষতার উপরে। তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রা, দেশের জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছু শ্রমিকের কর্ম-পটুতাকে প্রভাবিত করে। কর্মকর্তার সংযোগনৈপুণ্যের গুণেও শ্রমিকদের পটুত্ব বাড়ানো সম্ভব। শ্রমিকদের সংখ্যা যদি অতিরিক্ত কিম্বা অযথেষ্ট হয় তবেত শ্রমের মোট কার্যকারিতা কমে যায়। শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ভর করে তিনটি জিনিসের উপরে— মোট জনসংখ্যা, স্ত্রী ও পুরুষের

অনুপাত এবং একদিকে বালক ও বৃদ্ধ, ও অপরদিকে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত। শেষের দুটি যদি সহজে না বদলায় তবে শ্রমিক সংখ্যা প্রধানতঃ নির্ভর করবে মোট জনসংখ্যার উপরেই।

প্রায় দেড়শ বছর আগে, ১৭৯৮ তে, ম্যালথস বলেছিলেন যে প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং থাকবে, প্রতি পঁচিশ বা ত্রিশ বছরে দ্বিগুণিত হতে হতে। অপরদিকে খাদ্যের পরিমাণ তত দ্রুতগতিতে বাড়ানো সম্ভব নয়। অতএব একদিন না একদিন প্রত্যেক দেশেই খাদ্যাভাব ঘটবে, এবং তখন প্রকৃতির নির্মম হস্ত জন-সংখ্যা হ্রাসের কাজে নেমে আসবে। রোগে, অনাহারে, শিশুহত্যায়, যুদ্ধে, মারামারিতে জনসংখ্যা কমতে বাধ্য, যতক্ষণ না আবার প্রত্যেকের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য জোটে। কিন্তু সমস্যার এতে সমাধান হবে না, কারণ আবার জনসংখ্যা প্রত্যেক পুরুষে দ্বিগুণিত হতে থাকবে এবং আবার আসবে অনাহার এবং মহামারী এবং প্রকৃতির অমোঘ বিধান আবার বহু লোকের মৃত্যু ঘটাবে। তাই ম্যালথস বলেছিলেন যে রোগ হবার পরে সারানোর চেয়ে হতে না দেওয়া ভাল। জনসংখ্যা যদি আগে থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে অনাহার এবং মহামারী আসবেই না। সমাজের প্রত্যেকে যদি তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং এই প্রতিজ্ঞা করে যে সন্তানের পালন এবং শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপার্জন না থাকলে সে সন্তানের জন্ম দেবে না তবে চরম দুরবস্থা কোন কালেই আসবে না।

ম্যালথসের সিদ্ধান্তে অনেক ভুল বার করা আজ সম্ভব। কৃষিকার্যে ও যান্ত্রিক উৎপাদনে আজকাল এত উন্নতি হয়েছে যে একটা জগদ্ব্যাপী দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা এখন বহুদূরে। তাছাড়া সন্তানলাভের ইচ্ছাটাকে যত বড় বলে ম্যালথস মনে করেছিলেন আসলে সেটা যে তত বড় নয়

আজকালকার সমাজ সেটা প্রমাণ করেছে। জীবিকানির্বাহের উপায় এখন আগের চেয়ে কঠিনতর ; সন্তান পালন করতে এবং তাদের শিক্ষিত করতে পিতামাতার যে ব্যয় হয়, সন্তানের আয় থেকে ততটা লাভ পিতা-মাতার হয় না ; মেয়েদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা বেড়েছে এবং বিবাহিত মেয়েদেরও সকলেই সন্তান কামনা করে না। ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয় পাশ্চাত্ত্য দেশে দূর হয়ে গেছে ; যে ভয় এসেছে সেটা জন-সংখ্যা হ্রাসের ভয়। কুৎসিনস্কি প্রমুখ কয়েকজন বর্তমান যুদ্ধের আগে দেখিয়েছিলেন যে ইউরোপে অনেক দেশেই ভাবী জননীদের সংখ্যা কমে আসছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে জনসংখ্যার হ্রাস।

জনসংখ্যার হ্রাসের রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব অনেকখানি। অর্থনীতির দিক দিয়ে একথা বলা যায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা যেমন হানিকর, অত্যল্প জনসংখ্যাও তেমনি। ঠিক কত লোক থাকলে দেশের সব চেয়ে বেশি উপকার সেটা জানতে গেলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও উৎপাদন বিধির দিকে তাকাতে হয়। খুব অল্প লোক থাকলে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু এবং পরিপূর্ণ ব্যবহারই হয়তো সম্ভব হবে না ; আবার খুব বেশি লোক থাকলে প্রত্যেকের ভাগে এত কম পড়ে যাবে যে গড়পড়তা উৎপাদন ও আয় কম হবে। জনসংখ্যা যত হলে দেশের লোকের গড়পড়তা উৎপাদন, আয় ও স্বাচ্ছন্দ্য বহুলতম হবে সেটাকেই আমরা 'বাঞ্ছনীয়তম জনসংখ্যা' বলতে পারি। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে এই বাঞ্ছনীয়তম সহযোগ এখনো আসেনি সে দেশে সংখ্যা বাড়লে মঙ্গল ; যে দেশে এই বাঞ্ছনীয়তম সহযোগ অতিক্রান্ত হয়েছে সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও ক্রমবর্দ্ধমান হতে বাধ্য।

উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান মূলধন। যাতে উৎপাদনের সহায়তা হয় যার ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে, শ্রম লাঘব হয়, শ্রম অধিকতর পরিমাণে

কার্যকরী হয় তারই নাম 'বাস্তব মূলধন' ; লাঙল, করাত, তাঁত, ফ্যাক্টরির বিরাট যন্ত্র, সবই মানুষের শ্রমকে অধিকতর কার্যকরী করে। অবশ্য সাধারণত আমরা মূলধনকে অর্থের পরিমাপেই দেখি ; কিন্তু একথা বোঝা সহজ যে হাজার-টাকার কোনো উৎপাদন-ক্ষমতা নেই, হাজার টাকা দিয়ে গেঞ্জি বোনার কল কিনলে টাকাটা খাঁটি মূলধনে পরিণত হতে পারে। 'আর্থিক মূলধন'কে 'বাস্তব মূলধনে' পরিণত না করলে উৎপাদন অসম্ভব।

আর্থিক মূলধন আসে প্রথমত সঞ্চয় থেকে। উৎপাদক নিজেই যে সব সময়ে সঞ্চয় করে তা নয়— সুদ দিলেই অন্যের সঞ্চয় ধার করে আনা যেতে পারে, বিশেষত ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়। যে দেশে লোকের সঞ্চয়প্রবৃত্তি প্রবল— অপত্যস্নেহ, দূরদর্শিতা, লাভের আশা, প্রতিপত্তির লোভ বা অর্থগৃধ্নুতা, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন— যে দেশে সাধারণ লোকের আয় বেশি, এবং যে দেশে যথেষ্ট ব্যাঙ্ক আছে, বীমা-প্রতিষ্ঠান বা যৌথ ব্যবসায় আছে, সে দেশে সঞ্চয় বেশি হবার সম্ভাবনা এবং মূলধনও সে দেশে বেশি জুটবে। অবশ্য আর্থিক মূলধন বা সঞ্চয়কে বাস্তব মূলধনে পরিণত না করলে উৎপাদন অব্যাহত থাকবে না। আমাদের আর্থিক জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যাগুলির উৎপত্তি খুঁজলে দেখা যাবে যে অনেক সময়ই দেশের সঞ্চয় অর্থাৎ আর্থিক মূলধনের সবটা বাস্তব মূলধনে পরিণত হয় না, খানিকটা সঞ্চয় অব্যবহৃত পড়ে থাকে, যেটা ভোগ্যবস্তুর ক্রয়ে ব্যয় করা হয় না, আবার উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয় না।

মূলধন সংগ্রহের সমস্যা আধুনিককালে বৃহত্তর হয়ে এসেছে। আগে যখন উৎপাদন হত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে তখন একজনের পক্ষেই সবটা প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হত। তখন প্রতিষ্ঠানের মালিকই মূলধনের ব্যবস্থা করত এবং ক্ষতি হলে একাই সেটা বহন

৩

করত, লাভ হলে সবটা লাভই হত তার নিজের। ক্রমে যখন আরো একটু বড় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হল তখন দু-তিনজন অংশীদার মিলে মূলধন যোগানোর ভার নিল। আজকাল আর দু-তিনজন অংশীদারের সহযোগে কাজ চলে না; বহু অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণ হয়ে এসেছে তার নাম 'যৌথ প্রতিষ্ঠান'। অসংখ্য অংশীদার ছোট ছোট অংশে মূলধন সরবরাহ করে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করেন অংশীদারদের প্রতিনিধি বা 'ডিরেক্টর'রা। বছরে একবার প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়া অংশীদারদের আর কোনো কাজই নেই। যদি প্রতিষ্ঠানের লাভ হয় অংশের পরিমাণ অনুসারে অংশীদারের মধ্যে 'লভ্যাংশ' বণ্টিত হবে। যদি ক্ষতি হয়, অংশীদারের মূলধনটা নষ্ট হতে পারে, কিন্তু যদি সে একবার তার অংশের সবটা টাকা দিয়ে ফেলে থাকে তবে আর তার কাছ থেকে কেউ কিছু আদায় করতে পারবে না। অংশীদারের সুবিধা নানাদিকে—তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এবং ইচ্ছা করলে সে তার নিজের অংশ বাজারে বিক্রী করে দিতে পারে।

যৌথ প্রতিষ্ঠানই আজকালকার উৎপাদন সম্ভব করেছে। বিরাট ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন চালাতে হলে অনেক মূলধন প্রয়োজন এবং যৌথ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হত না। অংশ বিক্রয় ছাড়াও বাজার থেকে বা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে যৌথ প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করতে পারে; কিন্তু যারা টাকা ধার দেয় তাদের অধিকার মহাজনের; অংশীদারের অধিকার মালিকের। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে আসছে এবং যেখানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান 'সংঘবদ্ধ' হয়ে ব্যয়হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া লাভের চেষ্টাও করে সেখানেও যৌথ প্রতিষ্ঠানের নীতিই অবলম্বিত হয়।

জমি, শ্রম ও মূলধনের উপযুক্ত সহযোগ ভিন্ন উৎপাদনকার্য ভালোভাবে চলতে পারে না। এই সহযোগ নির্ভর করে কর্মকর্তার প্রয়োগ- বা সংযোগ-নৈপুণ্যের উপরে। উৎপাদন যতই জটিলতর হয়ে আসছে কর্মকর্তার প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রয়োজনও ততই বেশি অনুভূত হচ্ছে। কিভাবে প্রতিষ্ঠানে শ্রমবিভাগ হবে, কোথায় যন্ত্র ব্যবহৃত হবে, কোন্ জিনিসটা কোন্ সময়ে কতটা উৎপন্ন করতে হবে, ভবিষ্যতে চাহিদা কিরকম হবার সম্ভাবনা সবই কর্মকর্তাকে জানতে হবে এবং সেই অনুসারে কর্মচারীদের নির্দেশ দিতে হবে। যে ঝুঁকিকে বীমা করে অপসৃত করা যায় তাকে দূর করতে হবে এবং যে অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে কিছুই আগে থেকে বোঝা যায় না তার দায়িত্বও কর্মকর্তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিক যুগের প্রয়োগনৈপুণ্যের সব চেয়ে বড় উদাহরণ সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারে। শ্রমবিভাগের উপকারিতা বহুদিন আগে অ্যাডাম স্মিথ বিশদভাবে দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আজকালকার সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত শ্রমবিভাগ দেখবার সুযোগ তিনি পাননি। শ্রমিকদেব মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার ফলে তাদের প্রত্যেকের কাজ সহজ হয়েছে, কাজ শিখবার সময় কমে গেছে, শ্রমের কার্যকারিতা বেড়েছে, লোকের গুণ বা শক্তির পূর্ণ এবং যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে; এবং সর্বোপরি সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের ব্যবহার। যন্ত্রের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে, সস্তায়, দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে জিনিস উৎপন্ন করা যায়, শ্রমিকের গায়ের জোরে যা সম্ভব নয় যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে তা হতে পারে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা পূর্ণভাবে পেতে হলে চাই অনেক শ্রমিক; যন্ত্রপাতির সুবিধা বেশি করে পেতে গেলে লাগে অনেক মূলধন। অনেক শ্রমিক ও অনেক মূলধনের সহযোগে উৎপাদন সম্ভব করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান— যারা বহু কাঁচামাল কেনে,

অতএব সস্তায় কেনে, যে জিনিস ফেলে দেওয়ার কথা তা থেকে 'উপজাত' জিনিস তৈরি করে কিছুটা খরচ উঠিয়ে নেয়, যারা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রচুর এবং নূতন উদ্ভাবনে সহায়তা করে, যারা বিক্রী করে অনেক এবং বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা খরচ করে নিজেদের বাজার বড় করে তোলে। যে ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেখানে ছোট প্রতিষ্ঠানের দাঁড়িয়ে থাকা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না।

এর ফল যে সব সময়েই ভালো হয় তা নয়। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের জীবন যান্ত্রিক, আনন্দহীন হয়ে এসেছে; যন্ত্রপাতির অধিকতর ব্যবহারে বহু শ্রমিকের অন্তত সাময়িকভাবে বেকার হতে হয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে কদর্য, জনবহুল, অস্বাস্থ্যকর শ্রমিকপল্লী গড়ে ওঠে। এই কুফল নিরাকরণ আধুনিক সমাজের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ করে দিয়ে আবার কুটিরশিল্পের দিকে পিছিয়ে যাওয়া যখন অসম্ভব, তখন কুফল দূরীকরণের চেষ্টাই করতে হবে। যেখানে কাঁচামাল, শ্রমিক, যানবাহন, জলবায়ু, বাজার ইত্যাদির সুবিধা আছে সেখানে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 'একদেশতা' শ্রমবিভাগেরই দেশগত রূপ। শক্তির তারতম্য অনুসারে যেমন শ্রমিকদের মধ্যে কাজের ভাগ হয়, সুবিধার তারতম্য অনুসারে, তেমন পাটের কল সব স্থাপিত হয় কলকাতার আশেপাশে গঙ্গার তীরে আর কাপড়ের কল অনেক খোলা হয় বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে। এই একদেশতা থেকে শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু যন্ত্রশিল্পের কুফলের অনেকটা আবার এই কারণেই আসে। বহুলতম সুবিধার সন্ধানে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং শ্রমিকপল্লীর কদর্যতা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

এবাবে আমরা উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারি। আমরা আগেই দেখেছি, জমি, শ্রম ও মূলধন সহযোগে উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে এই তিনটি উপাদানের সহযোগিতাকে উপযুক্ততম ক'রে তুলতে হবে। ঠিক কতখানি জমির সঙ্গে কতখানি শ্রম ও কতটুকু মূলধনের সংযোগ হলে উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হবে সেটা অঙ্ক কষে বার করা যায় না; উৎপাদক নানা ভুলভ্রান্তির ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে সেটা জেনে নেয়, কখনো একটু মূলধন বাড়িয়ে এবং দু-জন শ্রমিক কমিয়ে দিয়ে, কখনো নূতন একফালি জমি কিনে, কখনো বা দশজন শ্রমিক নিযুক্ত করে। এ রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে সে ক্রমে উপাদান-সংযোগের 'বাঞ্ছনীয়তম অনুপাত' বার করে নিতে পারে। যতক্ষণ না এই অনুপাতে পৌঁছনো যায়, ততক্ষণ ঘাটতি উপাদানের পরিমাণ বাড়ালে মোট উৎপাদন বর্ধমান হারে বাড়তে থাকবে। আবার এই বাঞ্ছনীয়তম অনুপাত ছাড়িয়ে গেলে, অর্থাৎ যদি একটা উপাদানের তুলনায় অন্যগুলি অত্যধিক কিম্বা অন্য উপাদানের তুলনায় যে কোনো একটি অত্যধিক হয়ে পড়ে তবে মোট উৎপাদন কম হারে বাড়বে এবং গড়পড়তা উৎপাদন কমে আসতে থাকবে। অন্য সব উপাদানের পরিমাণ যেখানে অপরিবর্তিত আছে সেখানে একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়ালে যে বাড়তি উৎপাদনটুকু পাওয়া যাবে তাকে আমরা নাম দিতে পারি 'প্রান্তিক উৎপাদন'; বাড়তি উৎপাদনটুকু পেতে গিয়ে যে বাড়তি ব্যয়টুকু হল তাকে বলতে পারি 'প্রান্তিক ব্যয়'। বাঞ্ছনীয়তম অনুপাতে পৌঁছানোর কিছুটা আগে পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে বাড়তে যাবে এবং প্রান্তিক ব্যয় কমতে থাকবে; এবং এই অনুপাত ছাড়িয়ে গেলে প্রান্তিক উৎপাদন কমতে কমতে যাবে এবং প্রান্তিক ব্যয় বাড়তে থাকবে।

ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনে দেখা যায় যে অনেকদূর পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ানো বা প্রান্তিক ব্যয় কমানো সম্ভব। জমির গুরুত্ব ফ্যাক্টরির কাজে সামান্যই। যন্ত্রশিল্পের প্রধান প্রয়োজন কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতি। এগুলির সংযোগে বাঞ্ছনীয়তম অনুপাতে পৌঁছানো সহজ, কারণ এর যে-কোনোটারই পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে; এবং একবার উপযুক্ত অনুপাত খুঁজে পেলে সেই অনুপাত বজায় রেখেই প্রত্যেক উপাদানের ব্যবহার একসঙ্গে বাড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া নূতন নূতন আবিষ্কারে উপযুক্ততর অনুপাত খুঁজে পাবার সম্ভাবনাও আছে। কৃষিকার্যে অনেক সময়ই দেখি এর বিপরীত। এখানে জমির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি, এবং শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়ানো গেলেও জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না। বেশি ধান পেতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই জমিতে আগের চেয়ে বেশি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। যে দেশে অনেক জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে সে দেশে 'বিস্তৃত কৃষি' সম্ভব; কিন্তু জনবহুল দেশে সেটা সম্ভব নয়। চাষের কাজে বাঞ্ছনীয়তম অনুপাত দ্রুত এসে যায়, এবং তার পরে চাষ বাড়ানো মানেই হল একই পরিমাণ জমিতে বেশি বেশি অন্যান্য উপাদান নিয়োগ করা, অর্থাৎ কাম্য অনুপাতকে বিপর্যস্ত করা। এই জন্যই জমি চাষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে ও প্রান্তিক ব্যয় বাড়তে থাকে।

অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম সম্ভব। ফ্যাক্টরির প্রসার এতদূর হতে পারে যে সব উপাদানকে সঠিক অনুপাতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না; আবার বিশেষ কোনো একটি জমিতে নূতন চাষের পদ্ধতি ব্যবহারে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাসকে কিছুদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই জমিতে বেশি ধান উৎপন্ন করতে গেলে অসুবিধা বাড়তে থাকবে; এবং যন্ত্রশিল্পেও প্রান্তিক

উৎপাদনের হ্রাস আসে বলেই প্রতিষ্ঠানের প্রসার বেশি বাড়ানো সব সময়ে লাভজনক হয় না।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে উপাদান বিনিয়োগের অনুপাত সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়। কর্মকর্তার উদ্দেশ্য জিনিস উৎপাদন করে এবং বিক্রী করে লাভবান হওয়া, এবং লাভের একটা বড় উপায় গড়পড়তা ব্যয়কে নিম্নতম করে আনা। প্রান্তিক ব্যয়ের দিকেও কর্মকর্তার নজর রাখতে হয়, বিশেষ করে যখন উৎপাদন বাড়ালে কিছুটা 'প্রান্তিক আয়' হবার সম্ভাবনা থাকে। একটু বেশি জিনিস তৈরি করে যে বাড়তি আয়টুকু হয় তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্রান্তিক আয়'। মোট ৫০০৲ খরচ করে একশটি জিনিস উৎপন্ন করে যদি সেগুলি আট টাকা দরে বিক্রী করা যায় তবে মোট আয় ৮০০৲ এবং লাভ ৩০০৲। একশ দশটি জিনিস তৈরি করতে যদি মোট ব্যয় হয় ৫৪৫৲, আর সে কয়টি জিনিস আট টাকা দরে বিক্রী করে যদি ৮৮০৲ পাওয়া যায়, তবে প্রান্তিক ব্যয় ৪৫৲ আর প্রান্তিক আয় ৮০৲; অর্থাৎ দশটি জিনিস বেশি তৈরি করাতে লাভ আছে কারণ প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এই সহজ নিয়মটি মেনে চলে যে যতক্ষণ প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় থেকে বেশি ততক্ষণ উৎপাদন বাড়ানো হবে এবং থামা হবে তখন যখন প্রান্তিক ব্যয় ও আয় ঠিক সমান হয়ে গেছে, অর্থাৎ যখন আর উৎপাদন বাড়ালে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়কে ছাড়িয়ে যাবে। প্রান্তিক আয় ও ব্যয়ের সমতা যখন আসে তখনই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে সাম্যস্থিতি আসতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিনিময় ও মূল্য

পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা আর্থিক জীবনের প্রধান দুটি দিক দেখেছি— কি করে অভাবের তৃপ্তিকামনায় চাহিদার উৎপত্তি হয় এবং কি করে সেই চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনের ফলে জিনিসের সরবরাহ বাজারে আসে। চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের নাম 'বিনিময়', এবং শ্রমবিভাগের সমাজে বিনিময় আছে বলেই সকলের সব অভাব মিটতে পারে। বিনিময়ের হারের নাম 'মূল্য' এবং মূল্য যখন অর্থের মাপকাঠিতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলি 'দর' বা 'দাম'। 'মূল্য' আর 'দাম' কথা দুটি প্রায় একার্থকরূপে ব্যবহার করা গেলেও অনেকক্ষেত্রে দামের চেয়ে প্রশস্ততর একটি নাম প্রয়োজন। একটা কলমের দাম হয়তো দশ টাকা, কিন্তু তার মূল্য টাকার হিসাবে দশ, পেনসিলের হিসাবে হয়তো একশ, শার্টের হিসাবে হয়তো তিন। অবশ্য এক জিনিসের সঙ্গে আরেকটির সোজাসুজি বিনিময় আজকাল আর হয় না, তাই কার্যক্ষেত্রে মূল্য ও দাম প্রায় একই কথা।

মূল্যনিরূপণের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের একটা অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে প্রত্যেক জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে। একটা জিনিস হয়তো আর একটার 'বৈকল্পিক' কিম্বা 'অনুপূরক'; একটা জিনিস উৎপন্ন করতে গেলে আরেকটা হয়তো তৈরি হয়ে ওঠে না, যদি দুটি জিনিসের উৎপাদনে একই কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়; এবং সর্বোপরি, ক্রেতাদের আয় সীমাবদ্ধ বলে একটা জিনিসের চাহিদা সর্বদাই অন্য জিনিসের দামের উপরে নির্ভর করবে। এ-অবস্থায় বাজারে কোনো এক সময়ে কেন চালের দাম দশ টাকা,

কাপড়ের গজ দু টাকা, কয়লার মণ বারো আনা, টুথপেস্টের দাম দেড় টাকা এবং ট্রাম ভাড়া ছ পয়সা তা বলতে গেলে দ্রব্যমূল্যের 'সাধারণ' বা 'সার্বিক' সাম্যস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। প্রত্যেক জিনিসের দাম নির্ভর করবে জিনিসটার কাম্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বী জিনিসের সরবরাহ, ক্রেতার আয়, অন্যান্য জিনিসের সরবরাহ, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে। যদি সবগুলি অজ্ঞাত রাশি সম্বন্ধে আলাদা আলাদা সমীকরণ বার করে নেওয়া সম্ভব হয় তবে দ্রব্যমূল্যের সার্বিক সাম্যস্থিতির ভিতরের রূপটি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যেতে পারে; কারণ বীজগণিতের এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে যতগুলি অজ্ঞাত রাশি ততগুলি বিভিন্ন সমীকরণ পেলে রাশিগুলি আর অজ্ঞাত থাকে না।

যা বলা হল সেটা পথনির্দেশমাত্র, সমাধান নয়। কি কি পেলে আমরা সার্বিক সাম্যস্থিতির মূলে পৌছতে পারব তার একটা আভাস পাওয়া গেল, কার্যক্ষেত্রে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। সাধারণ সাম্যস্থিতির কারণ অন্বেষণ ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা কোনো দ্রব্যবিশেষের মূল্যের সাম্যস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করি তবে কিন্তু আমরা সহজেই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারি, কেবল চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তার থেকেই।

কয়েকটা সোজা জিনিস নিয়ে আরম্ভ করা যাক। চাহিদার সাধারণ নিয়ম এই যে, দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লেই চাহিদা কমে যায়; কতটা বাড়ে বা কমে সেটা নির্ভর করে চাহিদার পরিবর্তনশীলতার পরিমাপের উপরে। যোগানের সাধারণ নিয়ম এই যে, বাজারে জিনিসের দাম বাড়লে উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমলে দুটোই কমে যায়। চাহিদার পরিবর্তনশীলতার মত যোগানের পরিবর্তনশীলতারও পরিমাপ সম্ভব।

কোনো সময়ে যদি জিনিসের সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি হয়, অর্থাৎ বিশেষ একটি দামে যদি বিক্রেতারা বেচতে চায় কম পরিমাণে কিন্তু ক্রেতারা কিনতে চায় বেশি পরিমাণে তবে দাম উপরের দিকে উঠবে। আবার যদি চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হয় তাহলে দাম কমে যাবে। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দাম বাড়বেও না কমবেও না (অর্থাৎ সাম্যস্থিতি আসবে) তখন, যখন চাহিদা ও যোগান সমান সমান। পাঁচ টাকা দামে যদি চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হয় তবে দামটা ছ টাকার দিকে উঠবে ; কিন্তু দাম উঠলেই চাহিদা কমবে এবং সরবরাহ বাড়বে, অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য কমতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত পার্থক্য আর থাকবে না, চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হবে এবং দ্রব্যমূল্যের সাম্যস্থিতি আসবে। আবার সাত টাকা দামে যদি যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি হয় তবে তার ফলে দাম কমবে এবং দাম কমার ফলে যোগান কমবে এবং চাহিদার কিছুটা বৃদ্ধি হবে। শেষ পর্যন্ত পার্থক্যটা কিছুতেই থাকতে পারে না— পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে সাম্যস্থিতি আসতে বাধ্য।

অবশ্য চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের গুরুত্ব সব সময়ে ঠিক একরকমের নয়। চাহিদার পরিবর্তন হলে অল্পকালের মধ্যে যোগান বদলানো সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য অল্পকাল নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে মূল্যনিরূপণে চাহিদার গুরুত্বই বেশি ; যোগান যদি অপরিবর্তিতই থাকে তবে মূল্যের প্রত্যেক ওঠা-নামা চাহিদার পরিবর্তন এনে চাহিদাকে যোগানের সমান করে দেয়। চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন ক্রিয়া অন্যরকম। দীর্ঘকাল ধরে দেখলে বোঝা যায় যে চাহিদা সহজে বদলায় না। আমার কাপড়ের চাহিদা আজ বেশি, কাল কম হতে পারে, কিন্তু ১৯৪২ সালে আমি যে-কখানা কাপড়

কিনেছি, ১৯৪৩ সালে আমি সে-কথানাই কিনি, যদি না দাম বদলায় কিংবা আমার আয়ে বা স্বভাবে বা পরিবেশে কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে। সময় পেলেই সরবরাহ বাড়ানো কমানো যায় এবং মূল্য পরিবর্তনের ফলে সরবরাহ এসে অনায়াসে চাহিদার সমান হতে পারে। দীর্ঘকালীন চাহিদার পরিবর্তন যে যে কারণে হতে পারে সে কারণগুলিই অনেকটা অপরিবর্তনশীল; তাই দীর্ঘকাল নিয়ে আলোচনা করলে সরবরাহের পরিবর্তনের গুরুত্ব চোখে পড়ে। স্বল্পকালে চাহিদার পরিবর্তনে সাম্য আসে, দীর্ঘকালে আসে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধিতে। কাঁচির উপরেব ফলা কখনো কখনো এসে নীচের ফলার গায়ে লাগে, কখনো নীচের ফলা উঠে উপরের ফলাকে স্পর্শ করে; ফল একই, কারণ দুটি ফলা শেষ পর্যন্ত এক হবেই এবং তাহলেই কাঁচির সার্থকতা। চাহিদা এবং যোগানের সাম্যস্থিতিও আসবেই— চাহিদার পরিবর্তনেই হোক আর সরবরাহের পরিবর্তনেই হোক; এবং সে সাম্যস্থিতি 'স্থির'; কোনো কারণে বিপর্যয় ঘটলে আপনা থেকেই আবার সেই আগেকার সাম্যস্থিতি স্থাপিত হবে।

এখন কথা উঠবে, যে দামে চাহিদা এবং যোগান সমান হয় সেটা কি? ক্রেতার দিক থেকে দেখলে সহজেই বলা যায় যে দামটা প্রান্তিক কাম্যতার সমান; কারণ আমরা দেখেছি, প্রান্তিক কাম্যতা বাজারদরের চেয়ে বেশি হলে ক্রেতা জিনিসটা আরো কিনতে থাকবে, যতক্ষণ না অধিকপরিমাণে ক্রয়ের ফলে প্রান্তিক কাম্যতা কমে গিয়ে দামের ঠিক সমান হয়ে দাঁড়ায়।

বিক্রেতার দিক থেকে দামের সঙ্গে প্রান্তিক ব্যয়ের একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। আমরা আগের পরিচ্ছেদে দেখেছি, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় যতক্ষণ না সমান হয় ততক্ষণ

উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করে। যদি বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'পূর্ণতম' হয়, অর্থাৎ যদি বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশি হয় যে কোনো একজন বিক্রেতা তার উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করেও বাজারের মোট সরবরাহকে বিশেষ প্রভাবিত করতে না পারে, তাহলে বিক্রেতা বাজারদরটাকে স্থির বলেই ধরে নিতে পারে। বাজারে লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে যদি একজন বিক্রেতা মোটে একশটি সরবরাহ করে এবং জিনিসটির দর যদি হয় পাঁচ টাকা করে, তবে এই বিক্রেতা ১০১টি জিনিস বিক্রি করলেও পাঁচ টাকা করেই দাম পাবে (অর্থাৎ আগের চেয়ে ৫৲ বেশি পাবে), কারণ লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে একটিমাত্র বেশি জিনিস বাজারে আসাতে দামের কোনো তারতম্য হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে একটা জিনিসের দামও যা বিক্রেতার প্রান্তিক আয়ও তাই। বিক্রেতা নিজের লাভের আশায় যদি প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয়কে সমান করে আনে তবে সঙ্গে সঙ্গে দাম এবং প্রান্তিক ব্যয়ও সমান হয়ে যাবে। 'পূর্ণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র ক্ষেত্রে যে মূল্যে চাহিদা ও যোগানের সাম্যস্থিতি হবে সে মূল্য একদিকে প্রান্তিক কাম্যতার সমান এবং অন্যদিকে উৎপাদকের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় দুয়েরই সমান।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে অনেক বিক্রেতার মধ্যে না হয়ে অল্প কয়েকজনের মধ্যে হয় সেখানেও যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় আর প্রান্তিক আয় সমান হবে, কিন্তু দাম আর প্রান্তিক আয় সমান হবে না। 'স্বল্প-বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিক্রেতাই মোট সরবরাহের একটা বড় অংশের যোগান দেয় এবং যদি যে-কোনো একজন কিছু বেশি উৎপাদন করে তবে মোট সরবরাহের বেশ একটু বৃদ্ধি হবে এবং জিনিসের দামও কমে যাবে। প্রান্তিক আয় সেক্ষেত্রে দামের

সমান হবে না, কারণ সবটা জিনিসের দাম কমে গেলে, প্রান্তিক আয়ের সামান্যই বৃদ্ধি হতে পারে। যদি বাজারে পাঁচ টাকা দামে মোট সরবরাহ হয় পঞ্চাশটি জিনিস এবং একজন বিক্রেতাই যদি তার মধ্যে ত্রিশটি সরবরাহ করে তবে সেই বিক্রেতার মোট আয় ১৫০৲; যদি সে এবারে চল্লিশটি জিনিস বাজারে আনে তবে মোট সরবরাহ ৫০-এর জায়গায় হবে ৬০ এবং তার ফলে হয়তো দাম কমে গিয়ে চারটাকায় দাঁড়াবে। এই বিক্রেতাটি আগের বারে ত্রিশটি জিনিস বিক্রি ক'রে পেয়েছিল ১৫০৲; এবারে চল্লিশটি জিনিস বিক্রী ক'রে পাবে ১৬০৲। দশটি বেশি জিনিস উৎপন্ন করে প্রান্তিক আয় হল মাত্র ১০৲, অর্থাৎ দশটি জিনিসের দামের চেয়ে অনেক কম। এই দশটি জিনিস উৎপন্ন করা তখনই লাভজনক হবে যখন অনধিক দশ টাকা ব্যয়ে এই কটিকে বাজারে আনা চলে। অল্প কয়েকজন বিক্রেতার প্রতিদ্বান্দ্বিতায় প্রান্তিক আয় ও ব্যয় যদি সমান হয়, দাম থাকবে দুয়েরই উপরে।

বিক্রেতার সংখ্যা বহু থেকে অল্প, তারপরে দুই, এবং শেষ পর্যন্ত একে গিয়ে দাঁড়াতে পারে; 'বহু-বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা' থেকে আস্তে আস্তে 'দ্বি-বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা' এবং তারও পরে 'এক-বিক্রেতা' বা 'একচেটিয়া' ব্যবসায়ে আমরা নেমে আসতে পারি। যেখানে ব্যবসায় একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে একচেটিয়া হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ যেখানে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বা বিক্রয়ের উপরেই বাজারের মোট সরবরাহ নির্ভর করে, সেখানেও আমাদের সাধারণ নিয়মটি খাটবে; অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটির লাভ প্রভূততম হবে যখন প্রান্তিক আয় ও ব্যয় সমান, যদিও জিনিসের দাম দুয়েরই অনেক উপরে থাকতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিকের পক্ষে লাভ যথাসম্ভব বাড়ানো সহজ, কারণ বাজারের

মোট সরবরাহের সবটাই তার হাতে, এবং এই সরবরাহ বাড়ানো বা কমানো তার একার ইচ্ছাধীন।

তবে কোন্ সময় কি ভাবে চলা যুক্তিযুক্ত হবে সেটা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপরে— প্রথমত জিনিসটির চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল, না অনতিপরিবর্তনশীল, দ্বিতীয়ত জিনিসটি বেশি করে উৎপন্ন করতে গেলে প্রান্তিক ব্যয় বাড়ে, না কমে? আমাদের সাধারণ একটি ধারণা আছে যে একচেটিয়া ব্যবসায় হলেই জিনিসের দাম বাড়বে। কেউ যদি নুন, তেল বা কেরোসিনের মোট সরবরাহ একচেটিয়া করে নিতে পারে তবে অবশ্য সে ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশি দাম আদায় করতে পারবে, কারণ জিনিসগুলি প্রয়োজনীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হওয়াতে এদের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল। দাম বাড়ালেও লোকে এগুলি প্রায় আগের মত পরিমাণেই কিনবে। কিন্তু, যে জিনিসের চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল, সামান্য মূল্য বাড়লেই যার চাহিদা অনেকটা কমে যাবে, সে জিনিসের দাম বাড়ালে বিক্রেতারই ক্ষতি; প্রত্যেকটা জিনিসের দাম হয়ত সে বেশি পাবে, কিন্তু বিক্রিটাই যদি খুব কমে যায় তবে লাভের অঙ্কে ঘাটতি পড়বে। বরং, এক্ষেত্রে একটু দাম কমিয়ে যদি বিক্রির পরিমাণ খুব বাড়ানো যায় তবে বিক্রেতার লাভ। সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী যদি চাল ডাল তেল নুনের মত প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রী করে তবে সে দাম বাড়িয়ে দেবে; আর যদি সে সাবান, সিল্ক, বিদ্যুতের কারেণ্ট বা ঐরকম কোনো আরামের বা শখের জিনিস একচেটিয়া করে নিতে পারে তবে বেশি দামে কম জিনিস বিক্রি না করে কম দামে বেশি জিনিস বিক্রি করাই তার পক্ষে লাভজনক।

অবশ্য, ব্যয়ের দিকটাও দেখা দরকার। যে জিনিস বেশি করে তৈরি করতে গেলে প্রান্তিক ব্যয় বেড়ে যায় তা কম করে উৎপন্ন করাই লাভ

সুতরাং তার দাম বাজারে বেশি হবার সম্ভাবনা। আর যে জিনিস বেশি করে উৎপন্ন করতে গেলে প্রান্তিক ব্যয় কমতে থাকে তার উৎপাদন বাড়ানোই লাভের; এবং উৎপাদন বাড়ানো মানেই কম দামে বিক্রি করা। ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্টের সরবরাহ যদি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তবে কারেণ্টের দাম খুব বেশি হবে না, কারণ বিদ্যুতের চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে আরো কয়েকটা দিক দেখে চলতে হয়। খুব বেশি দাম বাড়ালে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যাবে, অতিরিক্ত লাভের লোভে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবেই; বিদেশ থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসতে পারে; ক্রেতারা একচেটিয়া ব্যবসায়ীর জিনিস না কিনে কাছাকাছি রকমের অন্য 'বৈকল্পিক' জিনিস কিনতে পারে, যেমন ট্রামের ভাড়া বাড়লে লোকে বাসে চড়তে আরম্ভ করবে; এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করে গবর্নমেণ্টকে দিয়ে মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করাতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসায় অবশ্য অনেক সময়েই সমাজের অনিষ্ট করে। এটা দুদিক দিয়ে সম্ভব হতে পারে। চিনির কলগুলি যদি সংঘবদ্ধ হয়ে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তবে একদিকে তারা যেমন হবে চিনির একমাত্র বিক্রেতা, আর একদিকে তারাই হবে আখের এবং স্থানবিশেষে শ্রমের একমাত্র ক্রেতা। চিনির কলের 'সংঘ' একমাত্র ক্রেতা হিসাবে আখচাষীকে কম দাম এবং শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে লাভ করতে পারে; একমাত্র বিক্রেতা হিসাবে আরো লাভ আসবে বাজারে চিনির দর বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে একচেটিয়া ব্যবসায়ে সমাজেরই লাভ। একই শহরে দুটি টেলিফোন কোম্পানি বা তিনটি

প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম কোম্পানি অযথা ব্যয়বাহুল্য; একটিমাত্র টেলিফোন কোম্পানি থাকলে ব্যয়ও কম, সুবিধাও বেশি। এসব ক্ষেত্রে একচেটিয়া উৎপাদনই যুক্তিযুক্ত, যদি অবশ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুব সজাগ হয় কিংবা যদি গবর্নমেণ্ট নিজের হাতেই উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের একটি প্রধান বিশেষত্ব মূল্যের বিভেদীকরণে। বহু-বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ একটি সময়ে একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রি হতে পারে না, ধনী ও নির্ধন একই দামে জিনিস কেনে। একচেটিয়া ব্যবসায়ে একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে বিক্রি হতে পারে, যে বিদ্যুৎ-কোম্পানি দু-আনা দামে কারেণ্ট বিক্রি করে গৃহস্থের কাছে, তারাই আবার সেই কারেণ্ট ফ্যাক্টরির মালিকের কাছে এক আনা বা তারও কম দামে বিক্রি করে। কলকাতায় আগে যারা সকালে বিকালে কাজের তাড়ায় ট্রামে বেরত তারা বেশি ভাড়া দিত আর যারা দুপুরে ধীরে সুস্থে ট্রামে চড়ত তারা কম ভাড়া দিত। একই বইয়ের একটা সংস্করণ বিক্রি হয় পাচ টাকায়, আরেকটা দুটাকায় এবং কিছুদিন পরেই হয়তো সুলভ সংস্করণ বেরোয় আট আনায়। রেলকোম্পানি সেগুন কাঠ নিয়ে যায় যে-ভাড়ায়, সে-ভাড়ায় কেরোসিন নেবে না; যে ভাড়ায় লক্ষপতিকে দার্জিলিং পৌছে দেয় আমাকে নিয়ে যায় তার চেয়ে অনেক কমে। সর্বত্র অবশ্য এটা সম্ভব নয়। একই জিনিস যদি এক দলের কাছে দামে বিক্রি হয় এবং আরেক দলের কাছে সস্তায়, এবং দ্বিতীয় দল যদি জিনিসটা সস্তায় কিনে আবার বিক্রি করতে পারে, তবে প্রথম দল জিনিসটা কিনতে উৎপাদকের কাছে না গিয়ে দ্বিতীয় দলের কাছেই যাবে। যে জিনিসটা ক্রেতা একবার কেনে আর একবার তখনই বিক্রি করে দিতে পারে সে জিনিসটার বেলা, এবং যেখানে একদল ক্রেতা ইচ্ছা করলে নিজেদের

আরেকদলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে সেখানে মূল্যের পার্থক্য করা অসম্ভব।

একই জিনিস বিভিন্ন দামে বেচাটাকে ক্রেতারা ভালো চোখে দেখে না। তাই ব্যবসায়ীরা অনেক সময় ক্রেতার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আরামের তফাত যতটা ভাড়ার তফাত তার চেয়ে অনেক বেশি। একটু পার্থক্য করে দিয়ে এবং ধনীর গরিমাবোধের সুবিধে নিয়ে রেলকোম্পানি যাত্রীদের বিভক্ত করে নেয়। একটু ভালো কাগজ দিয়ে বই ছাপলেই 'রাজ-সংস্করণ' বিক্রী হয়ে যায় যখন সস্তা দামের অন্য একটা সংস্করণও বাজারে আছে। একটু ভাল প্যাকিং, একটু সাজসজ্জা, চটক দিয়েই ক্রেতাকে ভোলানো সম্ভব। সিনেমায় আঠারো আনার সীটে বসে ন আনার দর্শকদের অবজ্ঞা করবার আনন্দ আমরা পাই; যা দেখলাম তা একই, কিন্তু হয়তো একটু ভালো আসন এবং নিজেকে অনেকের চেয়ে অভিজাত মনে করবার আনন্দের লোভে ডবল দাম দিতে কুণ্ঠিত আমরা হই না। ব্যবসায়ীরা এটা বোঝে; বড় ব্যবসায়ী সর্বদাই বড় মনস্তাত্ত্বিক।

ব্যবসায়ে ক্রেতার মনস্তত্ত্বচর্চার আর একটা ফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে কোনো কোনো জিনিসের দাম পনেরো আনা, বা এক টাকা পনেরো আনা বা হয়তো পাঁচ টাকা পনেরো আনা। মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, জিনিসটার দাম সোজাসুজি এক টাকা না করে পনেরো আনা করা কেন, পাঁচ টাকা পনেরো আনা দাম না নিয়ে ছ টাকা নিলেই তো ঝঞ্ঝাট কমে। কিন্তু লোকে সাধারণত পনেরো আনাকে এক টাকার চেয়ে অনেক কম মনে করে এবং ফলে এক টাকা দামে যা বিক্রি হয় পনেরো আনা দামে হয় তার চেয়ে অনেকখানি বেশি। আস্ত দুটি টাকাকে অনেক টাকা মনে হয়, কিন্তু

এক টাকা পনেরো আনা শুনলে মনে হয় মাত্র একটা টাকা আর কিছু খুচরো আনা। যে চাহিদা সাধারণত অনতিপরিবর্তনশীল তাও দু টাকা থেকে এক আনা দাম কমালে অতিপরিবর্তনশীল হয়ে যেতে পারে। অঙ্ক কষে হিসাব সাধারণ ক্রেতা করে না, মনের হিসাবই তাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

এবারে দ্রব্যমূল্যের আর একদিকে তাকাতে পারি। আগে একবার আমরা দেখেছি, প্রায় প্রত্যেক জিনিসের দামেরই অন্য জিনিসের দামের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে— হয় চাহিদার দিক থেকে, নয় যোগানের দিক থেকে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ধান ও খড় একত্র উৎপন্ন হয়; ধান পেতে গেলে খানিকটা খড় পাওয়া যাবেই। ধানের দাম যদি বাড়ে আর তার ফলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে সঙ্গে সঙ্গে খড়ের যোগানও বাড়বে এবং খড়ের দাম কমে যাবে। এরকম 'সহোৎপন্ন' জিনিসের উদাহরণ আমরা অনেক পাই, যেমন গ্যাস ও কোক, আটা আর ভূষি ইত্যাদি।

অনুপূরক জিনিসের কথা আমরা আগেই বলেছি। কালি আর কলম যদি পরস্পরের অনুপূরক হয় তবে একটার চাহিদা বাড়লে আর একটারও বাড়বে; অর্থাৎ কলম সস্তা হলে কালির দাম বাড়বার সম্ভাবনা। কলম সস্তা হয়ে গেলে কলম বিক্রি হবে বেশি, কালির ব্যবহার বাড়বে, এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কালির দামও বাড়তে থাকবে যতদিন না আবার কালির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মোটরগাড়ি ও পেট্রল, রুটি ও মাখন প্রভৃতি 'সহব্যবহার্য' জিনিসের উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে।

যদি একটা জিনিস অন্য একটার পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ যদি দুটি 'বৈকল্পিক' বা 'সমকার্যকরী' হয় তবে একটির দামের হ্রাসবৃদ্ধির

সঙ্গে অপরটির দামও কমতে বা বাড়তে বাধ্য। কফির দাম কমে গেলে চায়ের দামও কমবে, কারণ চায়ের চাহিদার কিছুটা কফির দিকে চলে যাবে। ব্লেডের দাম বেড়ে গেলে নিজে না কামিয়ে নাপিত ডাকলে দেখা যাবে সেও তার রেট বাড়িয়েছে। এরকম 'সমকার্যকরী' জিনিসের দাম পরস্পরের সমান হবার দিকে প্রবণতা আছে, এবং একটা জিনিস আর একটার যত কাছাকাছি হবে, তাদের দামের পার্থক্যও তত কম হবে।

আর এক রকমের উদাহরণ নিতে পারি। কামান বন্দুকের দামের সঙ্গে সেফটিপিনের দামের নিকট সম্পর্ক আছে বললে হয় তো হাস্যকর শোনাবে; কিন্তু কথাটা সত্যি। যে মূল জিনিসটি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয় সে জিনিসটি, অর্থাৎ ইস্পাত দিয়েই পিন তৈরি হয়। যুদ্ধের ফলে যদি অস্ত্রের চাহিদা বাড়ে তবে প্রায় সব ইস্পাত চলে যায় অস্ত্রনির্মাণে; সুতরাং পিন-নির্মাতাকে চড়া দামে ইস্পাত কিনতে হয় এবং পিনের দাম বাড়াতে হয়। একই জিনিস দিয়ে তৈরি বলে বেয়নেট ও পিনকে আমরা 'সমমূল' নাম দিতে পারি। এরকম সমমূল জিনিস অনেক আছে যেমন টেবিল ও আলমারি, কাঁচের গ্লাস ও জানালার সার্সি, সন্দেশ আর দই ইত্যাদি। 'সহোৎপন্ন', 'সহব্যবহার্য,' 'সমকার্যকরী' এবং 'সমমূল' জিনিসগুলির প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটির দাম অপর একটির বা অপর কয়েকটির দামের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত।

ফটকা বাজারের উল্লেখ করে এ অধ্যায় শেষ করতে পারি। সাধারণত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জিনিসের দাম নির্ভর করে প্রান্তিক কাম্যতা ও প্রান্তিক ব্যয়ের উপরে, কিন্তু দামের ওঠা-নামা থেকেই যারা লাভ করে নিতে চায় তারাও দামের উপরে প্রভাব আনে। সাধারণ ক্রেতা জিনিস কেনে ব্যবহার ক'রে তৃপ্তি পাবার আশায়; ফটকা ক্রেতা

কেনে লাভের আশায়। আজ যদি বাজারে পাটের দর কম থাকে এবং যদি এক মাস পরে দাম বাড়বে এ রকম মনে করবার কারণ থাকে তবে আজ জিনিসটা কিনে ধরে রাখতে পারলে পরে লাভ হবার সম্ভাবনা। অবশ্য ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে, কারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আন্দাজ করা হল সেটা নির্ভুল নাও হতে পারে। অনেক সময় জিনিস পরে সরবরাহ করা হবে এই সর্তে আগে থেকেই বেচে রাখা যায়। ফটকা বিক্রেতা জিনিস হাতে না নিয়েই বেচতে পারে— এই আশায় যে যখন সরবরাহ করতে হবে তখন সস্তা দামে কিনে দেবে। যদি সে সময়ে দাম কমে যায় তবে ফটকা বিক্রেতার লাভ, বেড়ে গেলে ক্ষতি। সুতরাং ফটকা দু রকমের— বেশি দামে বিক্রী করবার আশায় সস্তায় কিনে রাখা আর পরে সস্তায় কিনে সরবরাহ করা হবে এই আশায় আগে থেকেই বেশি দামে বেচে রাখা। আশা সফল হলে দুই ক্ষেত্রেই বিক্রেতার লাভ। ফটকা বাজারে বুদ্ধির লড়াই চলে— ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্দাজ যার যত নির্ভুল তার তত লাভের সম্ভাবনা।

যারা বাজার সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ তাদের ফটকা ক্রয়বিক্রয়ে লাভই হবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও লাভের সম্ভাবনা আছে। সস্তার বাজারে, অর্থাৎ বাজারে যখন অনেক জিনিস আছে, ফটকা ক্রেতা জিনিস কিনতে আরম্ভ করে; ফলে তখনই জিনিসের দাম একটু উঠতে থাকে, কারণ বাজারের চাহিদার সঙ্গে ফটকা ক্রেতার চাহিদা যোগ হল, বাজারের মোট সরবরাহের কিছুটা তার হাতে গিয়ে আটকে রইল। আবার যখন চড়া দামের বাজারে ফটকা ক্রেতা জিনিসটা ছাড়তে থাকে তখন দাম যা হতে পারত তার নীচে নামবে। অভিজ্ঞ ফটকা ক্রেতা সস্তার বাজারে কেনে এবং চড়াদামের বাজারে বিক্রী করে। তার ক্রয়বিক্রয়ের ফলে নীচু দাম উঁচু হয় এবং উঁচু দাম

নীচের দিকে নামে; ফটকা ক্রয়বিক্রয় না হলে দরের যে হ্রাসবৃদ্ধি হত, ফটকার ফলে তার চেয়ে অনেক কম হয়।

অবশ্য, এ কথা বলা যায় যখন কেবল অভিজ্ঞ লোকেরাই ফটকা বাজারে ক্রয়বিক্রয় করে। দুদিনে এবং অল্প আয়াসে বড়লোক হবার আশায় অনেক অনভিজ্ঞ লোক ফটকা খেলতে আসে, বোকামি করে, নিজেরা ঠকে এবং অন্যের অনিষ্ট ঘটায়। পাটের দর চার টাকা মণ দেখে অনভিজ্ঞ ক্রেতারা হয়তো কিনতে আরম্ভ করল, দুমাস পরে সাত টাকা দরে বিক্রি করবার আশায়; তাদের কেনার ফলে দাম, ধরা যাক, পাঁচ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল। দুমাস পরে পাটের দর সাত টাকায় না উঠে যদি নীচে নেমে তিন টাকায় দাঁড়ায় তবে হু হু করে সকলে বেচতে আরম্ভ করবে, কেউ ভয়ে, কেউ অনুতাপে, কেউ বা ফটকা খেলার জন্য ধার করা টাকা বেশিদিন আটকে রাখতে না পেরে; ফলে হয়তো দাম নামল দুটাকায়। ফটকা খেলোয়াড়দের নিজেদের ক্ষতি তো হলই, উপরন্তু, বাজারে এল বিপর্যয়। ফটকাবাজেরা এগিয়ে না এলে দাম নামত চার টাকা থেকে তিন টাকায়; ফটকার ফলে দাম হঠাৎ উঠল পাঁচ টাকায় এবং আবার ধপ করে নামল দুটাকায়। তাছাড়া অনেক রকমের জুয়াচুরির সুযোগ ফটকা বাজারে মেলে; জনকয়েক সংগতিপন্ন ফটকাবাজ নিজেদের স্বার্থলাভের জন্য দ্রব্যমূল্যের মোড় যে-কোনো দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, অন্তত সাময়িক ভাবে। আইন করে, বিধিনিষেধ দিয়ে, অনেকভাবে অনভিজ্ঞ এবং অসাধু ফটকাবাজের ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করার চেষ্টা অনেক দেশে হয়েছে; কিন্তু সাফল্যলাভ সম্ভব হয়নি। অভিজ্ঞ লোকের হাতে যা সমাজের উপকার করতে পারে অনভিজ্ঞ এবং বিবেকহীন লোকের হাতে তাই হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা দিতে গেলে

যে ফাঁকটুকু রাখতে হয় তা দিয়ে অসংখ্য অনভিজ্ঞ লোক ঢুকে পড়ে। ঘোড়দৌড় বা জুয়াখেলার মত ফটকাবাজারে লাভ করে অল্প দুএকজন, ক্ষতি হয় অনেকের ; কিন্তু এই অল্প কয়েকজনের লাভই অসংখ্য লোককে টেনে আনে।

পূর্ণপ্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে জিনিসেব দাম প্রান্তিক কাম্যতা ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়ে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে ; সেটা ভালো হয়, না মন্দ হয় তা বলা যায় না ; কিন্তু 'স্থিরতা' যে আসে সেটা ঠিক। এককালে ধনবৈজ্ঞানিকেরা পূর্ণপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই স্বাভাবিক এবং বাস্তব ধরে নিয়ে মূল্যতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। আজকাল বাজারে পূর্ণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথাও নেই ; তাই স্বল্পবিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। সরকারী ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং সরকারী মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রসার আজকাল যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতের উৎপাদন এবং মূল্যতত্ত্ব আলোচনা করতে যে পটভূমিকা আমরা পাব সেটা সমষ্টিগত উৎপাদনের এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণের। মূল্যতত্ত্বের মূলসূত্র কোনো অবস্থায়ই বদলাবে না, কিন্তু সমাজের পটভূমিকা বদলে গেলে দ্রব্যমূল্য নূতন রূপ নেবে নিশ্চয়ই।

•

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবিভাগ

মানুষের অভাববোধ থেকে কর্মপ্রচেষ্টার উৎপত্তি, অভাবমোচনের ফলে কাম্যতার হ্রাস, উৎপাদন এবং বিনিময় সংক্রান্ত মূলসূত্রগুলি আমরা আবিষ্কার করেছি। উৎপন্ন ধন কি ভাবে সমাজের নানা অংশের মধ্যে বণ্টিত হয় সেটা বুঝতে পারলেই আমাদের আলোচনা শেষ করতে পারি।

যেভাবে সামাজিক আয় বণ্টিত হয় সেভাবেই যে বণ্টন হওয়া উচিত এ কথা কেউ বলবে না। আমরা শুধু বর্তমান কালের বাস্তব জীবনে বণ্টন কিভাবে হচ্ছে সেটা বুঝে নিতে চাই ; কিভাবে হওয়া উচিত সেটা আলাদা প্রশ্ন।

উৎপাদন থেকেই আয় আসে— এবং সামাজিক আয় সমাজের নীট উৎপাদনেরই নামান্তর। জমিদারের দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিকের দেওয়া শ্রম, ধনিকের দেওয়া মূলধন এবং কর্মকর্তার প্রয়োগনৈপুণ্য ও অনিশ্চয়তাবহন, প্রধানত এই চারটি উপাদানের সহযোগে সমাজের মোট আয়ের উৎপত্তি। ভবিষ্যতের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে আয়ের সবটা ভোগ করা চলে না ; সমাজের মোট আয় থেকে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটা বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাই হল 'বিভাজ্য আয়' এবং সেটারই বণ্টন হয় সমাজের নানা অংশের মধ্যে।

এই বণ্টনে অংশীদার হয় তারাই যারা আয়-সৃজনের উপাদান যোগায়। সুতরাং সমাজের বিভাজ্য আয়ের একটা অংশ পায় জমিদার 'খাজনা'রূপে, একটা অংশ যায় শ্রমিকের 'মজুরি'তে, একটা অংশ 'সুদ' নামে ধনিকের অংশ হয়ে যায় এবং আর একটা অংশ হয় কর্মকর্তার 'লাভ'। খাজনা, মজুরি, সুদ ও লাভ— এই হল আয়ের চারটি পথ। যে-কোনো লোকের আয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে এই চারটির একটি বা ততোধিক ভিন্ন উপার্জনের আর কোনো পথ নেই।

একটা সহজ অবস্থা কল্পনা করে নিলে বণ্টনের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে নেওয়া যায়। যদি প্রত্যেক উৎপাদক প্রত্যেকটি নিযুক্ত উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজন হলেই বাড়াতে বা কমাতে পারে, তবে উপাদানটি ব্যবহার করে তার যে প্রান্তিক আয় হবে, কিংবা উপাদানের

যেটা 'প্রান্তিক উৎপাদন', সেটা যতক্ষণ উপাদানটির মূল্য থেকে বেশি ততক্ষণ তার পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়াই লাভজনক। শ্রমিক নিযুক্ত করে উৎপাদকের যেটুকু প্রান্তিক আয় হল সেটা যদি মজুরির চেয়ে বেশি হয় তবে সে আরো কয়েকজন শ্রমিক নিযুক্ত করবে নিশ্চয়ই। প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম অনুসারে যদি বেশি শ্রমিক নিযুক্ত করলে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন কমে যায় তবে শ্রমিক নিয়োগে কিছুটা অগ্রসর হলেই প্রান্তিক উৎপাদন কমতে কমতে মজুরির সমান হয়ে দাঁড়াবে। তেমনি দেখানো যায় যে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শেষ পর্যন্ত সুদের সমান হবে। আবার, প্রান্তিক কাম্যতা-সমতার নিয়ম অনুসারে উৎপাদক এমনভাবে শ্রম, মূলধন ইত্যাদি নিযুক্ত করবে যাতে প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক কাম্যতা বা প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। সুতরাং যদি আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রত্যেক উপাদানের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়ানো-কমানো যায়, প্রত্যেক উপাদানের অধিকতর নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যায় এবং উৎপাদক যে কোনো উপাদানের নিয়োগ কমিয়ে অন্য যে কোনো উপাদান পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারে তবে বণ্টনের ক্ষেত্রে একটা সহজ কার্যকারণচক্র আবিষ্কার অনায়াসেই করা যেতে পারে।

বাস্তব জীবনে অবশ্য বণ্টনের নিয়ম এত সহজ নয়, কারণ উপাদানের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো দুই-ই কঠিন এবং প্রান্তিক কাম্যতা কিছুদূর পর্যন্ত কমতে পারে এবং বাড়তেও পারে। সুতরাং অন্যদিক থেকে বণ্টনের সমস্যার দিকে তাকানো প্রয়োজন। সব রকমের আয়কে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। সাধারণত ধনিক টাকা জমায় সুদের আশায়; কতটা সুদ পেলে সে কত টাকা জমাবে সেটা তার মনে একরকম ঠিক আছে। ধার দিয়ে যদি সে

শতকরা চার টাকা সুদ পায় তবে বুঝতে হবে সে তার 'আকাঙ্ক্ষিত মূল্য'ই পাচ্ছে, কারণ আকাঙ্ক্ষিত মূল্য না পেলে সে টাকা ধার না দিয়ে খরচ করতে পারে বা অন্তত নিজের হাতে জমিয়ে রাখতে পারে। সুদের হার আকাঙ্ক্ষিত মূল্যের উপরেও শেষ পর্যন্ত থাকবে না, কারণ যদি সুদ খুব বেশি হয় তবে ধনিকেরা আগের চেয়ে বেশি টাকা জমাতে চেষ্টা করবে এবং তাতেই সুদের হার নীচে নেমে আসবে। যে শ্রমিক বলতে পারে যে মাসে পনেরো টাকা না পেলে সে কাজ করবে না সে যদি পনেরো টাকাই পায় তবে এক্ষেত্রেও তার আয় আকাঙ্ক্ষিত মূল্যেরই সমান। অপরদিকে জমির খাজনার সঙ্গে কোনো আকাঙ্ক্ষিত মূল্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বার করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে জমির খাজনা জমিদারের আকাঙ্ক্ষিত আয় থেকে অনেক বেশি হতে পারে; জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, তাই খাজনা বেশি হলেও জমির সরবরাহ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা কম। তেমনি কর্মকর্তার লাভও ঘটনাচক্রের আবর্তনে বা বাজারের অবস্থাগুণে আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণ থেকে অনেক বেশি হতে পারে। আর্থিক মূলধনের সুদ অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে দ্রব্যমূল্যের মত— বিক্রেতার যেমন একটা আকাঙ্ক্ষিত মূল্য থাকে যেটা না পেলে সে বেচবে না এবং যার চেয়ে বেশিও সে শেষ পর্যন্ত পায় না, ধনিকও তেমনি তার সঞ্চয়ের বাজার-দরই পায়। বিক্রেতার আকাঙ্ক্ষিত মূল্য তার উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে নির্ভর করে; মহাজনের আকাঙ্ক্ষিত মূল্য নির্ভর করে সঞ্চয়-জনিত অসুবিধার উপরে। অন্যদিকে জমির খাজনা ও কর্মকর্তার লাভ আশার অতিরিক্ত হয় অনেক সময়েই এবং শেষ পর্যন্ত এই দু-রকমের আয়ে 'উদ্‌বৃত্তের' প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে খাজনা ও লাভ আশার নীচেও যেতে পারে; সেক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্তটিকে ঋণাত্মক ধরে নিলেই চলবে।

কোনো আয় ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে মূল্যের মত, কোনো কোনো আয়ে মূল্য এবং উদ্বৃত্ত একত্রেই থাকে। শ্রমিকের মজুরি নিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। যদি সব শ্রমিক ঠিক একরকমের হত তবে সব কাজেই মজুরি একরকম হবার দিকে একটা প্রবৃত্তি দেখা যেত— শুধু হয়তো বিভিন্ন কাজের শ্রমের বা কষ্টের বিভিন্নতা অনুসারে একটু ইতরবিশেষ মাত্র হত। কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে এক কাজ থেকে আর এক কাজে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। শ্রমবিভাগের ফলে নূতন এক জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে প্রত্যেককে একটা বিশেষ কাজ অনেকদিন ধরে শিখে নিতে হয় এবং যার ফলে একবার একটা কাজ শিখলে সে কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যুদ্ধের বাজারে এঞ্জিনিয়ারেব আয় বেড়ে গেছে দেখে উকিলের পক্ষে যেমন এঞ্জিনিয়ার হয়ে যাওয়া অসম্ভব তেমনি ছুতোরের আয় বাড়লেই তাঁতীরা অবিলম্বে তাঁত চালানো ছেড়ে করাত ধরতে পারে না। জাতিভেদ এখন আর বংশগত বা রক্তগত ততটা নয় যতটা শিক্ষা এবং শ্রমবিভাগজনিত।

অতএব, প্রত্যেক শ্রমিককেই তার নিজের গণ্ডীর মধ্যে সাধারণত আবদ্ধ থাকতে হয় এবং এর ফলে তারা নানা অসুবিধায় পড়ে। মনিবের সঙ্গে দর-কষাকষিতে শ্রমিকের প্রধান অসুবিধা দুটি। প্রথমত, শ্রম সঞ্চয় করে রাখা যায় না, আজকের মত কাজ না পেলে কাল দুদিনের কাজ একত্র পাবার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, চাহিদার পরিমাণ অনুসারে শ্রমিকের যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না, এবং যদি চাহিদা-হ্রাসের ফলে মজুরি কমে যায় তাহলেও শ্রমিকদের পক্ষে অন্য কাজের খোঁজ নেওয়ার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবান্তর। সুদের হার কমে গেলে ধনিক টাকাটা না ধার দিয়ে অন্য কাজে লাগাতে পারে ; মজুরির হার কমে গেলে সেরকম কোনো স্বাধীনতা শ্রমিকের নেই। বিক্রি না করতে

পারার সামর্থ্য বিক্রেতার সব চেয়ে বড় জোর ; সঞ্চয়-বিক্রেতা ধনিকের সে সামর্থ্য আছে, শ্রম-বিক্রেতা মজুরের নেই।

যদি কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে এক শিল্পে কাজ না নিয়ে অন্য এক শিল্পে চলে যেতে পারে সেক্ষেত্রে তারা মজুরি হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণই পাবে। বিশেষ একটি শিল্পে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মজুরি নির্ভর করবে তারা অন্য শিল্পে কি পেতে পারে তার উপরে ; মজুর যদি পাটের কলের কাজ ছেড়ে কাপড়ের কলে চলে যেতে পারে তবে পাটের কলেব মালিক বাধ্য হয়ে মজুরদের অন্তত সেই মূল্য দেবে যা তারা কাপড়ের কলে পেতে পারত। কিন্তু এ স্বাধীনতা শ্রমিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। প্রায় সব শিল্পেই শ্রমিকের সংখ্যা অতিরিক্ত এবং তাদের পক্ষে অন্য কাজে যাওয়া অসম্ভব ; তাই তাদের মজুরি হয় কম, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত মূল্যের সঙ্গে একটা ঋণাত্মক উদ্বৃত্ত সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মজুরিতে ধনাত্মক উদ্বৃত্তও থাকতে পারে। আজকাল এঞ্জিনিয়াররা আগের চেয়ে বেশি আয় করে, যে আয়ের আশায় তারা এঞ্জিনিয়ার হয়েছিল তার চেয়ে বেশি উপার্জন করে। তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এঞ্জিনিয়ারদের সাময়িক সংখ্যাল্পতায়। চট করে অন্য লোক এঞ্জিনিয়ার হয়ে যেতে যদি পারত তবে এক্ষেত্রে মজুরিব হারও নীচে নেমে আসত। জমির পরিমাণ কম হওয়াতে খাজনাতে যে রকম উদ্বৃত্ত থাকে, বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরিতেও বিশেষ অবস্থায় সে রকম উদ্বৃত্ত থাকতে পারে।

সাধারণ শ্রমিকের আয়ে ঋণাত্মক উদ্বৃত্তই দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে আয়ের আশায় তারা বিশেষ একটি কাজ শিখেছিল তার চেয়ে তারা কমই পায়। সাধারণ শ্রমিক সহজ কাজের দিকে যায় এবং সহজ কাজে অনেকেই যেতে পারে। ফলে এসব কাজে শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য

হয় এবং শ্রমিকের মজুরি নীচের দিকে নামতে থাকে। অবশ্য আজকাল 'মজুর-সংঘ' স্থাপন করে মজুরি বাড়াবার চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। বাস্তবে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য, মজুর-সংঘ সেখানে কৃত্রিম সংখ্যাল্পতা সৃজন করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটায়। যদি ফ্যাক্টরির মালিক সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের বদলে যন্ত্র বা অন্য শ্রমিক দিয়ে কাজ চালাতে পারে কিম্বা যদি মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনব্যয় এত বৃদ্ধি পায় যে চাহিদা কমে গিয়ে উৎপাদন কমাতে বাধ্য করে তবে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়েও বিশেষ লাভ করতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা অন্যরকম এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা অনেক শিল্পেই তাদের মজুরি বাড়াতে সফলকাম হয়েছে।

মজুরির মত সুদের হারও নির্ভর করে মূলত মূলধনের জন্য চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগানের উপরে। মূলধন ব্যবহারে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে এবং উৎপাদকের কাছে সেজন্য মূলধন কাম্য। বেশি বেশি মূলধন ব্যবহারে প্রান্তিক উৎপাদিকাশক্তি কমে যাবার সম্ভাবনা; তাই মূল-ধনের সরবরাহ অতিরিক্ত হলে খাতক বা উৎপাদক কম সুদ দিতে চাইবে। সুদের হার বেশি হলে মূলধন কাজে লাগানো হবে কেবল সেখানে যেখানে উৎপাদিকা শক্তি বেশি; সুদের হার কম হলে যেক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম সেক্ষেত্রেও উৎপাদনের প্রসার হবে। সঞ্চয়ের যোগান নির্ভর করে ব্যয় করে আনন্দ পাওয়া এবং সঞ্চয় থেকে আয় পাওয়া এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরে। সঞ্চয় মানে বর্তমানে ভোগ করবার সুবিধা ত্যাগ, ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা। সাধারণত লোকে ভবিষ্যৎ লাভের চেয়ে বর্তমানের আনন্দকেই বড় করে দেখে এবং সেজন্য সঞ্চয়প্রবৃত্তি থেকে ভোগপ্রবৃত্তি অনেক বলবান। কিন্তু সঞ্চয় যদি লাভজনক হয়ে ওঠে তবে ভোগপ্রবৃত্তিকে কিছুটা চাপা দেওয়া

যায়, এবং কে কতটা তা করতে রাজি আছে তার উপরে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। জিনিসের যোগানে যেমন বিক্রয়-দর দিয়ে উৎপাদনের ব্যয়কে পুষিয়ে নেওয়া হয়, মূলধনের যোগানেও তেমনি সুদের আয় দিয়ে সঞ্চয়ের, বা ভোগ থেকে বঞ্চিত হবার, নিরানন্দকে দূর করা হয়। একদিকে মূলধনের চাহিদা নির্ভর করে তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপরে, অন্যদিকে যোগান নির্ভর করে সঞ্চয় বা প্রতীক্ষার নিরানন্দ কে কতটা বহন করতে রাজি তার উপরে। বেশি সঞ্চয় মানেই বেশি নিরানন্দ বা অসুবিধা; অর্থাৎ সঞ্চয়ের 'প্রান্তিক অনিচ্ছা' বাড়তে বাড়তেই চলে; বেশি সুদ না পেলে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় আসবে না।

জিনিসটাকে আর একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। বর্তমান ভোগের কাম্যতা বেশি বলেই সঞ্চয়ে অনিচ্ছা আসে এবং সুদ দিয়ে সেই অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু সঞ্চয়ের অনিচ্ছা দূর হলেই যে ধনিক টাকা ধার দেবে তার মানে নেই। যে টাকাটা সঞ্চিত হল সেটা সে হাতে ধরে রেখে দিতে পারে। টাকা হাতে ধরে রাখারও অনেক সুবিধা আছে; যখন খুশি সেটাকে খরচ করা যায়, হঠাৎ প্রয়োজন হলে কাজে লাগানো যায়, কিম্বা হঠাৎ কোনো লাভের সম্ভাবনা দেখলে নিয়োগ করাও যায়। টাকা ধার দিলে শুধু ভোগের আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হতে হয় না, নগদ টাকা হাতে ধরে রাখবার সুবিধাও ত্যাগ করতে হয়। ভোগের ইচ্ছার পরেও আছে নগদ টাকা হাতে রাখার কাম্যতা; সঞ্চয়ের অনিচ্ছার চেয়েও বলবান ধার দেবার অনিচ্ছা। অধমর্ণকে বাধ্য হয়ে এমন সুদ দিতে হয় যা সঞ্চয়ের অনিচ্ছাকেই শুধু পরাভূত করে না, ধার দেবার অনিচ্ছাকেও দাবিয়ে দেয়।

এতক্ষণ আর্থিক মূলধনের সুদের আলোচনাই করেছি; আর্থিক মূলধন বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত হলে তা থেকে যে আয় হয় তার স্বরূপ কিছুটা

অন্যরকমের। কলকাতার কাছে রানাঘাটে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে যে বাড়ি তৈরি করেছে সে হয়তো আশা করেছে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে মাসে পনেরো টাকা পাবে। হঠাৎ যদি কোনো কারণে কলকাতার লোক রানাঘাটে পালাতে থাকে তবে সে বাড়ির ভাড়া চল্লিশ-পঞ্চাশে উঠতে পারে। হঠাৎ রানাঘাটে বাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন বাড়ি তৈরি হওয়া অসম্ভব, এবং কতদিন এই বর্ধিত চাহিদা থাকবে সেটা না জেনে নূতন বাড়ি কেউ করবে না। অতএব যার বাড়ি আগে থেকেই আছে সে তার নিযুক্ত টাকার সুদ যা হতে পারত তা তো পাবেই এবং তার উপরে রানাঘাটে বাড়ির সংখ্যাল্পতার জন্য উদ্বৃত্তও পাবে অনেকটা। যা তাব আকাঙ্ক্ষা ছিল, প্রাপ্তি হল তার চেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে বাস্তব মূলধন থেকে আয়কে আমরা 'উদ্বৃত্তযুক্ত আয়' বলতে পারি।

এই উদ্বৃত্ত অবশ্য সাময়িক। যদি কলকাতার লোক রানাঘাটে গিয়ে দেখে জায়গাটার সুবিধা অনেক তবে তাদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস কববার ব্যবস্থা করবে। রানাঘাটেব জনসংখ্যা স্থায়ী-ভাবে বৃদ্ধি পেলে ক্রমে নূতন বাড়ি তৈরি হবে, বাড়ির ভাড়া কমবে এবং আস্তে আস্তে বাড়ির ভাড়া নির্মাণব্যয়ের সুদের সমান গিয়ে দাঁড়াবে। আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে শেষ পর্যন্ত পার্থক্য থাকবে না।

সাময়িকভাবে এ রকম ক্ষেত্রে ঋণাত্মক উদ্বৃত্তও দেখা যেতে পারে। কলকাতা থেকে লোক পালাতে আরম্ভ করলে কলকাতার বাড়িওয়ালার আয় এত কমে যেতে পারে যে বাড়ির জন্যে খরচ করা টাকাটার সুদও পাওয়া যাবে না। আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রাপ্তি হবে কম। কিন্তু যদি কলকাতার লোক স্থায়ীভাবেই কমে যায় তবে নূতন বাড়ি তৈরি হবে না, পুরানো বাড়ির সংস্কার হবে না, পুরানো বাড়ি ভেঙে পড়লে তার

জায়গায় অন্য বাড়ি উঠবে না। ফলে বাড়ির যোগান কমে গিয়ে বাড়িভাড়া আবার নির্মাণব্যয়ের সুদের সমান হয়ে দাঁড়াবে। যদি স্থায়ী-ভাবেই বাড়িভাড়া নির্মাণব্যয়ের সুদের চেয়ে কম থাকবার প্রবৃত্তি দেখা যায় তবে বাড়ি ইত্যাদি তৈরি না করে ব্যাঙ্কে টাকা ফেলে রাখাই লাভজনক এবং কেউই নিজের বাড়িতে থাকতে চাইবে না, সকলেই ভাড়াটে বাড়ি খুঁজবে।

বাড়ির উদাহরণ নিয়ে বাস্তব মূলধন সম্বন্ধে যা বলা হল তা আরো ভালোভাবে খাটে জমির বেলা। বাড়ির সংখ্যা স্থানবিশেষে সাময়িক ভাবে সীমাবদ্ধ, জমির পরিমাণ সর্বস্থানে চিরকালের জন্য সীমাবদ্ধ। কোনো এক শহরে জনসংখ্যা বাড়লে বাড়িওয়ালার আয়ে উদ্বৃত্ত দেখা দেবে; দেশে জনসংখ্যা বাড়লে জমিদারের আয়েও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

রিকার্ডো প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে জমি-দারের আয়ের সবটাই উদ্বৃত্ত। রিকার্ডোর মতে জমিদার খাজনা পায় তিন কারণে— জমির সংখ্যাল্পতা, বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং প্রত্যেক জমির উৎপাদিকাশক্তির ক্রমিক হ্রাস। তৃতীয় কারণটির জন্য একটিমাত্র জমির উপরে সমাজ নির্ভর করতে পারে না; সমাজের অভাব মেটাতে গেলে অনেক জমি চাষ করতে হয়। কিন্তু সব জমি সমান উর্বরা নয়, কোনোটায় উৎপাদন ব্যয় বেশি, কোনোটায় কম। সমাজের অভাব মেটাতে গেলে এবং দ্রব্যমূল্যের সাম্যস্থিতি আনতে গেলে যে-কটি জমি চাষ করা আবশ্যক তার মধ্যে যেটি অধম সেটিরই উৎপাদন ব্যয় জিনিসের দাম নিরূপিত করবে। কারণ যদি দাম তার চেয়ে কম হয় তবে এই অধম বা 'প্রান্তিক জমি'টি চাষ হবে না এবং এটি চাষ না হলে সমাজের অভাব মিটবে না। কার্যকরী চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে যদি

এই জমিটি চাষ করতেই হয় তবে জিনিসটির দাম দিয়ে এই জমির উৎপাদন-ব্যয় পুষিয়ে নিতে হবে।

প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয় যদি ফসলের দাম নির্ণয় করে তবে যে জমি প্রান্তিক জমির চেয়ে ভালো সেটা চাষ করলে উৎপাদন-ব্যয় কম হবে এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্ত থাকবে। উদ্বৃত্তটা প্রথমত চাষীর হাতে আসবে, কিন্তু জমির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হলে চাষী বাধ্য হয়ে খাজনা-রূপে সেই উদ্বৃত্তটুকু জমিদারকে দিয়ে দেবে। রিকার্ডোর মতে জমি-দারের আয়ের সবটাই 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' এবং এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ জমির শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ।

একটা জিনিস রিকার্ডো লক্ষ্য করেননি। একই জমি যদি নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তবে সেই জমির আয়ের সবটাই আকাঙ্ক্ষার উপরে উদ্বৃত্ত নয়।) যে জমিতে ধানও চাষ করা যায়, পাটও চাষ করা যায়, সে জমিতে প্রত্যেক ব্যবহারে একটা আকাঙ্ক্ষিত আয় আছে— ধান চাষ করে যা পাওয়া যাবে অন্তত সেটা না পেলে জমিটা পাটচাষে নিযুক্ত হবে না; যদি তার চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় তবে সেই বেশিটুকুকে খাঁটি উদ্বৃত্ত বলা যেতে পারে। মোট জমির পরিমাণ যতটা সীমাবদ্ধ, ধানের জমির পরিমাণ ততটা সীমাবদ্ধ নয়; মোট জমির সরবরাহ বাড়ানো যায় না, কিন্তু ধানের জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় যদি অন্য কিছুর চাষ কমানো সম্ভব হয়। আমরা আগে দেখেছি যে উপাদানের যোগান বাড়ানো-কমানো সম্ভব হলে আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত কমে যায়; জমির বেলাও সেটা সম্ভব যদি একই জমি বিভিন্ন কাজে লাগান যায় এবং একরকম ব্যবহার থেকে অন্যরকম ব্যবহারে নিয়ে যাওয়া যায়। জমির আয়কে পুরোপুরি উদ্বৃত্ত না বলে উদ্বৃত্ত-যুক্ত আয় বলাই সংগত। অবশ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ জমির বেলা বেশি

হবে এবং উদ্বৃত্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীও হতে পারে।

উদ্বৃত্তযুক্ত আয়ের আর একটি উদাহরণ কর্মকর্তার লাভ। এক্ষেত্রেও অনেকে মনে করেন যে ব্যবসায়ের লাভ ও জমির খাজনা ঠিক একই প্রকৃতির; খারাপ জমি চাষ হয় বলেই ভালো জমির চাষে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে অপেক্ষাকৃত অপটু উৎপাদকের মালও চলে বলে সুপটু উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয় হয়। কিন্তু এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত প্রত্যেক কর্মকর্তা এক ব্যবসায়ে না এসে অন্য ব্যবসায়ে যেতে পারত; একবার বিশেষ একটি পথ বেছে নিলে অবশ্য পরে পরিবর্তন শক্ত, কিন্তু পথ বেছে নেবার আগে সে প্রত্যেকটির সম্ভাবনা ভালো করে বিচার করে দেখে। সুতরাং যে বিশেষ ব্যবসায়ে সে শেষ পর্যন্ত নামল সেটাতে তার একটা আকাঙ্ক্ষিত আয় আছে, অন্য ব্যবসায়ে সে যা পেতে পারত অন্তত সেটুকু আয় সে আশা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে নিজেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত করতে পারে; স্বাধীন ব্যবসায় না করে যদি অন্যের ব্যবসায়ে বেতনভোগী ভাবে কাজ করা লাভজনক হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাই করবে। অন্যের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হয়ে কাজ করলে যে মজুরি সে পেতে পারবে অন্তত সেটুকু আয়কে তার আকাঙ্ক্ষিত আয় বলে ধরে নেওয়া উচিত। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু সে পায় তবে সেটা হল খাঁটি উদ্বৃত্ত। মালিকের আয়কেও তাই উদ্বৃত্ত না বলে উদ্বৃত্তযুক্ত আয় বলাই সংগত।

এই উদ্বৃত্তের অংশ ক্ষেত্রবিশেষে স্বল্পকালস্থায়ী, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালস্থায়ী হবার সম্ভাবনা। উদ্বৃত্ত হতে পারে নানা কারণে — সাময়িক ঘটনার সংস্থানে হঠাৎ অতিরিক্ত লাভ হয়ে যেতে পারে, কিংবা অন্যের চেয়ে কম ব্যয়ে জিনিস উৎপন্ন করলে আকাঙ্ক্ষিত মূল্যের

চেয়ে বেশি পাওয়া যেতে পারে। সব জমি যেমন সমান নয় সব কর্মকর্তাও সমান নয়। উপাদান-সংযোগের ফলেই হয় উৎপাদন এবং এই উপাদান সংযোগের নৈপুণ্য যার যত বেশি তার উৎপাদনব্যয় তত কম হবে। শ্রমিকের মজুরি, সুদের হার যে কর্মকর্তা কম দিয়ে পারে তার ব্যয় হ্রাস সহজ। ব্যবসায়ের ঝুঁকিগুলিকে আগে থেকে বুঝতে চেষ্টা ক'রে যে বীমা ইত্যাদি উপায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা দূর করতে পারে শেষ পর্যন্ত তার ব্যয়ও কমই পড়বে। উৎপাদনব্যয় কমানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা জিততে পারল, তারা তাদের শ্রমের মূল্য তো পাবেই, অধিকন্তু নিজেদের প্রয়োগনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে উদ্বৃত্তও ভোগ করবে।

এই উদ্বৃত্ত নিয়ে অনেক সমস্যা ওঠে বলেই আকাঙ্ক্ষিত ও মূল্য এবং উদ্বৃত্তকে আলাদা করে নেওয়া ভালো। কোনো আয় যদি আকাঙ্ক্ষিত মূল্যের সমান হয় তবেই সেটা ন্যায়সংগত হল তা বলা যায় না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজে বা যে সমাজে স্বার্থবুদ্ধিই কর্মের প্রেরণা যোগায় সে সমাজে আকাঙ্ক্ষিত মূল্য না পেলে কেউ উপাদান সরবরাহ করতে চাইবে না। যে মজুর এক কাজ ছেড়ে আর এক কাজে যেতে পারে তার স্বল্পতম আকাঙ্ক্ষাও অন্তত যদি পূর্ণ না হয় তবে সে কাজ করবে না। টাকা ধার করতে গেলে মহাজনের আকাঙ্ক্ষিত মূল্য দিতেই হবে, কারণ তা না দিলে টাকাটা অন্যদিকে চলে যেতে পারে। কর্মকর্তার কাজ পেতে গেলে শ্রমিক রূপে সে যা পেতে পারত বা অন্য ব্যবসায়ে সে যা উপার্জন করতে পারত অন্তত সেটুকু তাকে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ-অনুপ্রেরিত সমাজে আকাঙ্ক্ষিত মূল্যে ঘাটতি পড়লে উপাদানের সরবরাহ কমবে এবং তার ফলে উৎপাদনও কমবে।

যে আয়ে উদ্বৃত্ত আছে সেখানে উদ্বৃত্তটুকু বাড়তি পাওনা ধনতান্ত্রিক সমাজে থেকেও একথা বলা যায়। উদ্বৃত্ত না পেলেও উপাদানের

সরবরাহ কমবে না। এই উদ্বৃত্ত অনেক সময়েই সামাজিক পরিবেশের বা ঘটনা-সংস্থানের জন্য হয় বলে এটার ভোগে সমাজের অধিকারের একটা যুক্তিসংগত দাবি উপস্থিত করা যায়। দেশে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যদি জমিদারের উদ্বৃত্ত আয় বাড়ে তবে সে আয় তার 'অনর্জিত'— সে উদ্বৃত্ত ভোগের অধিকার জমিদারের, না জনসাধারণের? সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তির আয়ে উদ্বৃত্ত থাকতেই পারে না; ধনিকতন্ত্র থাকতে থাকতেই উদ্বৃত্তের ন্যায়সংগততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবর্তন

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থার যে বিশেষ রূপটি বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে ধনিকপ্রধান বলে বর্ণনা করা যায়, এবং ধন-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি আধুনিক কালে এই ধনিকতন্ত্রের পরিবেশের মধ্যেই কাজ করে যায়। পঞ্চাশ বছর আগেও ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌রা ধনিকতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমের গুণগান নিঃসংকোচে করেছেন; উনবিংশ শতাব্দীর অনেক পণ্ডিতের হাতে ধনবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল একথা প্রমাণ করা যে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সমাজের এবং ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি চরমতম হয়ে উঠবে। গত পঞ্চাশ বছরের ভিজ্ঞতায় এবং বোধশক্তির পূর্ণতর বিকাশে সে মনোভাব কেটে গেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রেট ব্রিটেনে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল তার জের এখনো চলেছে—ক্যাপিটালিজম বা ধনিকতন্ত্রের ইতিহাসই গত পৌনে দু শ বছরের ইতিহাস।

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস খুঁজলে একটা সাধারণ ধারা দেখতে পাওয়া যাবে। যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে মানুষ যখন বিশেষ বিশেষ দেশে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলল তখন তাদের পেশা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যাযাবরের পেশা শিকার ও জন্তুপালন; গৃহস্থের পেশা কৃষিকর্ম ও কুটিরশিল্প। ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগে তাই দেখি মানুষের প্রধান বৃত্তি জমি-চাষ এবং প্রধান ঐশ্বর্য জমি। সুতরাং এই দ্বিতীয় যুগে জমির মালিকেরাই সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছিল। বহু শতাব্দী ধরে কৃষিকর্ম ও কুটিরশিল্প ব্যক্তির জীবিকার পথ নির্দেশ করেছে এবং সমাজে জমিদারের প্রাধান্য অবিসংবাদে স্বীকৃত হয়েছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্ত্য যে-কোনো দেশের ইতিহাসেই একটা দীর্ঘকাল-স্থায়ী ফিউড্যাল বা জমিদার-প্রধান যুগ খুঁজে পাওয়া যাবে। ফিউড্যাল যুগের শেষভাগে বণিক-সভ্যতার সূত্রপাত। যান্ত্রিক উৎপাদন আরম্ভ হবার আগেই বণিকদের স্থান ক্রমশ উপরে উঠে আসছিল; কিন্তু ফিউড্যাল সমাজের আসল ভাঙন শুরু হল তখনই যখন ফ্যাক্টরির উৎপাদনে বাজার ছেয়ে যেতে আরম্ভ করল।

এই তৃতীয় যুগের সূচনা হল প্রথমে গ্রেট ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। যান্ত্রিক উৎপাদনের জন্য যে-সব উপাদান প্রয়োজন, ব্রিটেনে তার সবই ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইত্যাদির বাণিজ্যের ফলে দুই শতাব্দী ধরে প্রচুর মূলধন দেশে সঞ্চিত হচ্ছিল এবং ধনিকেরা সে মূলধন খাটাবার সুযোগ-সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। দেশে লোহা ছিল, কয়লা ছিল, ভালো বন্দর ছিল, নূতন রাস্তাঘাট তৈরি হয়ে চলাচল সহজতর হয়ে আসছিল এবং তা ছাড়া ছিল ইংরেজদের অসাধারণ উদ্যম ও উৎসাহ। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটেনে এক বিরাট পরিবর্তন এল; হারগ্রীভ্‌স, ক্রমটন, আর্করাইট প্রভৃতির আবিষ্কৃত যন্ত্রাবলী এবং জেম্‌স

ওয়টের স্টীম এঞ্জিন যন্ত্রশিল্পকে কায়েম করে দিল। ১৭৫০ সালে ব্রিটেনে চাষবাস ও কুটিরশিল্পই প্রধান বৃত্তি ছিল— এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা বহির্বাণিজ্য; ১৮০০ অব্দ পূর্ণ হবার আগেই ল্যাঙ্কাশায়ারে বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদ পাকা হয়ে গেল। তারপরে ১৮০৬এ প্রথম স্টীমার চলল, ১৮২৫এ রেলগাড়ী। যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে যন্ত্রবাহিত চলাচলের সংযোগে যে বিরাট পরিবর্তন এল তার নাম দেওয়া হল 'শিল্প-বিপ্লব' বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলুশ্যন। এই পরিবর্তনেই ধনিকপ্রধান সমাজের স্থাপনা হল।

শিল্প-বিপ্লব ব্রিটেনে সর্বাগ্রে হয়েছিল বলে ক্যাপিটালিজমের ইতিহাসে ইংরেজদেরই স্থান প্রধান। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে এই শিল্প-বিবর্তন ইতিহাসের একটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী অধ্যায় এবং সবদেশেই এটা আসতে বাধ্য। যে বিবর্তন ব্রিটেনে হল ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে, জর্মানী ও আমেরিকায় সেটা হল গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, জাপানে বর্তমান শতকে এবং ভারতবর্ষে এই বিবর্তন এখনো চলেছে। সুতরাং সমস্ত পৃথিবীতে এই এক ধরনের সভ্যতা এবং আর্থিক জীবন-যাত্রা এসেছে কিংবা আসছে। আমরা আগেই বলেছি ইতিহাসের শেষ পাতায় পৌঁছুতে আমাদের অনেক দেরি, ক্যাপিটালিজম একটা মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদ মাত্র। কিন্তু তবু এই পরিচ্ছেদটি বর্তমান সমাজের আলেখ্য এবং যতই অবাঞ্ছনীয় হোক না কেন এই ধনিকতন্ত্রের মূলতত্ত্ব ভাল করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

ধনিকপ্রধান সমাজের প্রধান বিশেষত্ব, উৎপাদনকার্যে মূলধনের মালিকের প্রাধান্য। কোনো কিছু উৎপন্ন করতে গেলে চাই জমি, কাঁচামাল ও প্রকৃতিগত অন্যান্য সম্পদ, মানুষের দেওয়া শ্রম এবং ধনিকের জমানো মূলধন। এই সব উপাদানের বিভিন্ন প্রকারের সহযোগে বিভিন্ন

জিনিস তৈরি হয় এবং এই তিনের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি সেটা তর্কনীতি বা সহজবুদ্ধি দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু ধনিকপ্রধান সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে প্রাধান্যটা চলে গেছে মূলধনের মালিকের হাতে। যার হাতে মূলধন আছে সে প্রাকৃতিক সম্পদ সহজেই আহরণ করতে পারে। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে যারা মূলধন সরবরাহ করে তারা হল মালিক আর যারা শ্রম দেয় তারা বেতনভোগী মজুর।

ধনিকতন্ত্রের গুণগান যাঁরা করেছেন তাঁরা বলেন যে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রেরণা আসে স্বার্থবুদ্ধি থেকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি তার নিজের স্বার্থ অন্বেষণের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া যায় তবে সকলের কর্মপ্রচেষ্টাই পূর্ণতম হবে এবং সমাজের মঙ্গলও তাতেই। আরও বিশেষ করে তাঁরা বলেছেন যে জীবজগতের সাধারণ নিয়ম-অনুসারেও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের চরম বিকাশ এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হতে বাধ্য। অতএব এই প্রতিযোগিতাকে যাতে নিরঙ্কুশ করে তোলা যায় তাই হওয়া উচিত সমাজের এবং সরকারের উদ্দেশ্য। গবর্নমেণ্ট যদি কেবল শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার রক্ষা ছাড়া আর কোনো কিছু না করতে যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ক্ষেত্রে যত বাধা আছে সব নির্মূল করে দেয় তবেই সমাজের সবচেয়ে বেশি উপকার।

ধনিকপ্রধান সমাজের আর একটি বিশেষত্ব আর্থিক অসাম্য। এই অসাম্য আসে নানা কারণে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সকলের সামর্থ্য সমান নয় এবং পূর্ণপ্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণতম সুবিধা নেওয়াও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই কারও আয় বেশি, কারও কম। অসাম্যের আর একটি বড় কারণ উত্তরাধিকার। সঞ্চিত অর্থ বতমান সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে নেমে আসে এবং কয়েক পুরুষেই সেটার আয়তন বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে। ধনিকতন্ত্র সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত করে তুলবার চেষ্টা

করেছে। আমরা একথা মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, আমি যা সঞ্চয় করি, আমি যা উপায় করি এবং আমি উত্তরাধিকারসূত্রে যা পাই তার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব সম্পূর্ণ আমার; এমন কি আমার নিজের কোনো শ্রম ব্যতীতও যদি আমার কোনো লাভ হয় তবে তাও নিঃসন্দেহে আমার।

বর্তমান সমাজ শুধু যে এই অসাম্যকে বজায় রাখে তা নয় অসাম্যকে সমাজের মঙ্গলের কারণ বলেও নির্দেশ করে। জোর দিয়ে একথা বলা হয় যে অসাম্যই কর্মের প্রেরণা যোগায়। আমরা কাজ করি তখনই যখন আমাদের আশা থাকে যে অন্তের চেয়ে উঁচুতে উঠব। ধনিক-তন্ত্রের সমর্থক বলবেন, রাম চায় শ্যামের চেয়ে বড়লোক হতে, শ্যাম চায় রামকে ছাড়িয়ে যেতে; ফলে দুজনেই বড়লোক হয়। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষেত্র বজায় রাখতে গেলে অসাম্যের প্রয়োজন; অসাম্য সম্ভব না হলে রাম ও শ্যাম দুজনেরই উদ্যম এবং উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ অর্থনীতিবিশারদ এরকম যুক্তি দিয়েই ধনতন্ত্র, উত্তরাধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অসাম্যের সমর্থন করেছিলেন।

ক্যাপিটালিজম এখনো আছে কিন্তু তার স্বপক্ষের যুক্তিগুলির অসারতা আজকাল লোকে বুঝতে শিখেছে। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল এ বিশ্বাস আজ কারও নেই, কারণ লোকে দেখেছে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, সংঘর্ষ, যুদ্ধ ইত্যাদির উপশম তো ঘটেইনি, বরং সমস্যা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং গভীর হয়ে এসেছে। তাছাড়া এটাও দেখা গেছে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তবে তার অবসান ঘটে সংঘবদ্ধ ব্যবসায়ের আবির্ভাবে। সংঘবদ্ধ ব্যবসায় একদিকে শ্রমিক এবং কাঁচা-মালের উৎপাদকের অনিষ্ট করে তাদের কম দামে শ্রম এবং জিনিস

বেচতে বাধ্য করে এবং অন্যদিকে ক্রেতাদের অনিষ্ট করে চড়া দামে জিনিস বেচে এবং সে উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে উৎপাদন কমিয়ে। যে আপাত মনোহর যুক্তি দিয়ে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ধনতন্ত্র'কে সমর্থন করা হয়েছিল সে যুক্তি 'সংঘমূলক ধনতন্ত্রে'র সমর্থনে অচল। অসাম্য এবং উত্তরাধিকারের স্বপক্ষে যে যুক্তিধারাব বর্ষণ গত শতাব্দীতে হয়ে গেছে আজকাল তাদের প্রভাব ক্ষীণ। ধনিকপ্রধান সমাজের পরিবর্তনের প্রয়োজন আজকাল প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে। পরিবর্তনটা ঠিক কি রকম এবং কি ভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু মূলকথা এই যে, লোকে দেড়শ বছরের পুরানো এবং দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত একটা সমাজব্যবস্থাকে প্রশ্নের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার আদর্শ অস্বীকার করে নিয়ন্ত্রিত সহযোগিতার আদর্শের পক্ষে মতবাদ গড়ে উঠেছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পদ্ধতিরও বিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যেক যুগেই দেখা গেছে, সমাজের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের একটা অন্তরঙ্গ যোগ আছে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে 'মার্কেণ্টাইলিস্ট' নামধারী একদল পণ্ডিতের প্রাধান্য ছিল। তাঁরা বলতেন দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে বহির্বাণিজ্যের উপরে; বাইরে থেকে কাঁচামাল এনে সেটাকে নূতন রূপ দিয়ে আবার বিদেশে পাঠালে ধনাগম হবে এবং প্রত্যেকেরই কর্তব্য এমন কিছু করা যাতে উৎপাদন এবং বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা এবং রুপা নিজের দেশে আসে। বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এই মার্কেণ্টাইলিস্টরাই প্রথমে দেখিয়ে দেয়; উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল আসবে এবং সেই উপনিবেশই আবার রপ্তানী মাল কিনবে।

ব্রিটেনের খ্যাতনামা মার্কেণ্টাইলিস্ট টমাস ম্যান তাঁর বই লেখেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তার আগেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়েছে, ভারতবর্ষের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও স্থাপিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে 'ফিজিয়োক্র্যাট' নামে একদল সমাজতাত্ত্বিকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে ধনবণ্টনের মূলনীতির সন্ধান। নানারকম আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ধন উৎপাদন করতে পারে একমাত্র চাষীরা; সমাজের অন্য সকলে সেই ধন নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাষীর ধন চাষীর কাছেই ফিরে আসে। কর্মনীতির দিক দিয়ে এঁরা জমির উপরে কর বসাবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এঁদের ধারণা ছিল যে এই একটিমাত্র করের আয় দিয়েই সরকারের সর্বপ্রকার ব্যয়নির্বাহ সম্ভব হবে। এঁদের মতবাদেই আমরা প্রথম দেখতে পাই অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস। বহুদিন পর্যন্ত অর্থনীতি-বিশারদরা এ বিশ্বাস ছাড়তে পারেননি; সমাজবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর মধ্যে প্রকৃতির গুপ্ত অথচ কল্যাণময় হস্তের ক্রিয়া এখনো অনেকে দেখতে পান।

ফিজিয়োক্র্যাটদের রচনাগুলি ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৬র মধ্যে প্রকাশিত হয়। এর অল্প পরে, ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত 'ওয়েল্‌থ্ অব্ নেশন্‌স্' রচনা শেষ করেন। ব্রিটেনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধনবিজ্ঞানের বিশদ আলোচনার সূত্রপাত অ্যাডাম স্মিথে। যে বছর তাঁর বই প্রকাশিত হল সে বছরেই আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সে নূতন রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রসার তখনই হতে আরম্ভ করেছে। শিল্পবিবর্তন তো আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে এবং অ্যাডাম স্মিথ আগতপ্রায় নূতন সমাজের

সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ না করতে পারলেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; তাই তাঁর আলোচনার প্রথম বিষয় শ্রমবিভাগ এবং পরে মূলধনের প্রকৃতি, সঞ্চয় এবং ব্যবহার, নাগরিক অর্থনীতি, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি। স্মিথের আলোচিত বিষয়সূচী দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁর দৃষ্টিকোণ বর্তমান যুগের কত কাছাকাছি। শ্রমের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সম্বন্ধ নির্ধারণ, ব্যবহার্য জিনিসের 'ব্যবহার-মূল্য' এবং 'বিনিময়-মূল্যে'র মধ্যে পার্থক্য সন্ধান, প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুণবর্ণন, প্রকৃতিগত শৃঙ্খলার স্বরূপ, শ্রমিকের মজুরি এবং ধনিকের লাভের মধ্যে বিপরীত গতিসম্বন্ধ, রাজস্ব-সংগ্রহের মূলনীতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে ওয়েলথ অব নেশন্স্ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবশ্য-পাঠ্য।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার যে পথ স্মিথ খুলে দিলেন তাকে আজকাল বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল' পথ— ম্যালথস, রিকার্ডো এবং জেমস মিলের হাতে এই পথ প্রশস্ততর হল এবং ক্লাসিক্যাল মতবাদের পূর্ণ-পরিণতি দেখা গেল উনিশ শতকের মধ্যভাগে জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনায়। ১৭৯৮ সালে ম্যালথস দেখালেন যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খাদ্যসম্ভারবৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর এবং যদি লোকে স্বেচ্ছায় সন্তান-জন্মের হার কমানোর চেষ্টা না করে তবে একদিন খাদ্যাভাব আসবেই; তখন অনাহার, অপুষ্টি, রোগ, শিশুমৃত্যু ও শিশুহত্যা এবং যুদ্ধ অনিবার্য। মানুষের শুভবুদ্ধির উপরে ম্যালথসের বিশ্বাস ছিল না, তাই তাঁর লেখাতে নৈরাশ্যের সুরই প্রধান। ১৮২০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পলিটিক্যাল ইকনমি'তে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাতে ক্যাপিটালিজমের সমালোচনা পাওয়া যায় কিন্তু কোনো আশার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বর্ণ এবং মুদ্রানীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রধান বই ১৮১৭ সালে লেখা; সে

বইয়ে আলোচিত দ্রব্যমূল্য এবং ধনবণ্টনের তত্ত্ব বহুদিন অর্থনীতির ছাত্রের বেদরূপে গণ্য হত। স্মিথের মতই শ্রমের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা রিকার্ডোও করেন, কিন্তু তিনি এ আলোচনাকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যান। রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্ব-অনুশীলন থেকেই একদিকে ক্লাসিক্যাল পণ্ডিত জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর রক্ষণশীল ব্যাখ্যার উপাদান পেয়েছিলেন এবং আর একদিকে কার্ল মার্ক্‌স্ তাঁর সাম্যবাদী মতের সমর্থন পেয়েছিলেন। জমির খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডো যে আলোচনা করেছিলেন সেটা এখনো মূল্যবান এবং তাঁর মুদ্রানীতি ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মতবাদে যে আধুনিকতা আছে তাতে বিস্মিত হতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জর্মানিতে ইংরেজ অর্থনীতিবিদের সিদ্ধান্তগুলি সমালোচনা করেন দুদলের লেখক— এক দল জাতীয়শিল্প সংরক্ষণের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করেন এবং অন্য দল ধনবিজ্ঞানের আলোচনাকে ঐতিহাসিক আলোচনার রূপ দিতে চেষ্টা করেন। ব্রিটেনে যখন যন্ত্রশিল্প পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছে তখন নূতন করে যন্ত্রশিল্প স্থাপন করতে গেলে জর্মানির অসুবিধা হওয়ারই কথা। ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা অবাধ বাণিজ্যের অনুমোদন করেছিলেন, জর্মান লেখক ফ্রেডারিক লিস্ট সংরক্ষণ-নীতির সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। আমাদের দেশে সরকারী কর্মনীতির আলোচনায় এবং সমালোচনায় আজ একশ বছর পরেও লিস্টের প্রভাব অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়।

ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতদের নানা মতবাদ অনেকের লেখায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল : এগুলি একত্রে গেঁথে, এদের মধ্যে অসংগতিগুলি বর্জন করে, যথাসম্ভব সংহতি রক্ষা করে একটা সম্পূর্ণ ধনবিজ্ঞান পাঠকের সম্মুখে ধরে দেবার কৃতিত্ব জন স্টুয়ার্ট মিলের। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশদ

গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। অথচ এই ১৮৪৮ সালেই কার্ল মার্ক্‌সের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশিত হয়। একই সময়ে দেখি, একদিকে মিল রক্ষণশীল ধারা অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় আছেন, অন্যদিকে মার্ক্‌স্ ধনিকপ্রধান সমাজের অনুজ্জ্বল দিকটা উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যাপৃত। এর পর থেকে দুটি ধারা অনেকটা আলাদা আলাদা ভাবে চলেছে। ক্লাসিক্যাল ধারা অস্ট্রিয়ান এক পণ্ডিতব্যূহ এবং ইংরেজ আলফ্রেড মার্শালের হাতে একটা প্রায় গাণিতিক রূপ নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে চলে এসেছে ; সমাজতন্ত্রী ধারা মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং তাঁর অনুগামীদের রচনায় পূর্ণতররূপে প্রকাশিত হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আমরা আবার দেখছি এই দুই ধারাকে সম্মিলিত করবার প্রয়াস। বর্তমান যুগের উৎপাদন, মূল্য ও বণ্টনতত্ত্ব আলোচনা এবং আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞান, সবই সমাজতন্ত্রী প্রভাবে অনেক পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ক্লাসিক্যাল ধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে ক্রেতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। স্মিথ থেকে রিকার্ডো সকলেই দ্রব্যমূল্যকে প্রধানত উৎপাদক বা বিক্রেতার দিক থেকেই দেখেছেন, যদিও উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে মাপা হবে সেটা বিতর্কের বিষয় হয়েই ছিল। ১৮৫৪ সালে গসেন কোনো জিনিস ব্যবহারের ফলে তার কাম্যতার হ্রাস হয় এই নিয়মটি আবিষ্কার করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অনেক জিনিস যদি হাতের কাছে থাকে তবে সেগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু ব্যবহার না করলে পরিতৃপ্তিকে বহুলতম করা অসম্ভব। গসেনের পরে অস্ট্রিয়াতে মেঙ্গার প্রমুখ কয়েকজন ক্রেতার মনোভাব এবং ক্রেতার আচরণকে দ্রব্যমূল্যের সাম্যস্থিতি আনয়নের প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেন এবং

ব্রিটেনে জেভন্‌স্‌ প্রান্তিক কাম্যতা হ্রাসের নিয়মকে কলন-গণিতের ভাষায় রূপ দেন।

জেভন্‌সের পরে দুইটি ধারা আমাদের চোখে পড়ে। ইউরোপে লসানে একটা পণ্ডিতগোষ্ঠী গড়ে উঠছিল ওয়ালরাসের নেতৃত্বে। ১৮৭৪ সালে ওয়ালরাস্‌ দ্রব্যের প্রান্তিক তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং পরে এ আলোচনা আরো গভীরভাবে করেন তাঁর শিষ্য প্যারেটো ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে। জিনিসের তৃপ্তিদান-ক্ষমতাকে ভালো করে বুঝতে গেলে অনেক গোলমালে পড়তে হয় বিশেষত যখন তৃপ্তির তুলনা অসম্ভব। তাই তৃপ্তিদান-ক্ষমতার দিকে তাকানো ছেড়ে দিয়ে প্যারেটো জিনিসের 'কাম্যতা'র দিকে নজর দিলেন। একটা জিনিস তৃপ্তি দেয় কি না, অন্য জিনিসের চেয়ে বেশি দেয় না কম দেয় সে খোঁজে না গিয়ে জিনিসটা লোকে চায় কিনা এবং সেটা পেতে গেলে অন্য জিনিস কতটা ছাড়তে রাজি আছে সে তথ্যই আমাদের সন্ধান করা উচিত। তাঁর পূর্ববর্তী ইংরেজ লেখক এজ্‌ওয়র্থের প্রবর্তিত জ্যামিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্যারেটো দেখান যে ক্রেতাদের পছন্দের তুলনা করতে পারলেই দ্রব্যমূল্যের 'সার্বিক সাম্যস্থিতি'র মূল কারণে পৌঁছানো যায়। ১৯৩৪ সালে ইংরেজ লেখক হিক্‌স্‌ আবার এজ্‌ওয়র্থ এবং প্যারেটোর পদ্ধতিকে ধনবিজ্ঞানের মূল্যতত্ত্বে সংস্থাপিত করবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় ধারাটির উৎপত্তি কেম্‌ব্রিজের অ্যালফ্রেড মার্শালের রচনায়। তাঁর প্রথম বই বেরয় ১৮৭৯ সালে; কিন্তু তাঁর প্রধান রচনা 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব ইকনমিক্‌স্‌' প্রকাশিত হয় আরো এগারো বছর পরে। মিলের মত মার্শালও তাঁর পূর্ববর্তীদের মতবাদ হৃদয়ংগম করে সেগুলির মধ্যে সংগতি আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে

উৎপাদন-শ্রম ও ক্রেতার তৃপ্তি এই দুইয়ের স্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। অনেক জিনিস অবশ্য তাঁকে ধরে নিতে হয়েছিল এবং সব কিছুকে 'অচল' কল্পনা করে বিশেষ একটি জিনিসের চাহিদা এবং সরবরাহ পরিবর্তন হলে কি হয় তাতেই তাঁর আলোচনা অনেকটা আবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ধরে নেওয়া সব কিছু স্বীকার করে নিলে তাঁর সিদ্ধান্তের গাণিতিক পরিচ্ছন্নতায় চমৎকৃত হতে হয়।

আরো অনেক নূতন জিনিস মার্শালের রচনায় পাওয়া গেল। রিকার্ডো দেখিয়েছিলেন প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয় থেকে ভালো জমির উৎপাদন-ব্যয় কম বলে উৎপাদকের একটা উদ্বৃত্ত থাকে। মার্শাল বললেন, উৎপাদকের উদ্বৃত্তের মত জিনিসের ভোগ বা ব্যবহার যে করে তারও উদ্বৃত্ত থাকে, কারণ ক্রেতা যে দামটা পর্যন্ত উঠতে রাজি আছে সে দাম তাকে প্রায়ই দিতে হয় না। ধনিকসমাজের অর্থনীতিবিদ উৎপাদকের উদ্বৃত্তের দোষ কাটাতে ক্রেতার উদ্বৃত্ত তৃপ্তির সন্ধান দিলেন। ধনবিজ্ঞান আলোচনায় কালবিভাগের গুরুত্বও আমরা মার্শালের কাছেই শিখেছি। স্বল্পকালীন কার্যকারণ-সম্বন্ধ দীর্ঘতর কালে গিয়ে রূপ বদলাতে পারে এটা মার্শাল দেখিয়েছিলেন নানাস্থানে— দ্রব্যমূল্যের কারণ-নির্ণয়ে এবং বিশেষ করে স্থায়ী জিনিসের আয়ের প্রকৃতি নির্ধারণে।

ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় এমন ক্ষেত্র নেই যেখানে মার্শালের কিছু না কিছু দান না আছে। মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনশীলতাকে মার্শাল গাণিতিক নিয়মে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং আর্থিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে 'অতিপরিবর্তনশীল' ও 'অনতি-পরিবর্তনশীল' চাহিদার প্রভাবের তারতম্য প্রদর্শন করেন। ব্যয়ের কোন্ অংশ উৎপাদনের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে কমে বা বাড়ে না এবং কোন্ অংশ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কমে বাড়ে অর্থাৎ কোন্‌টা 'গৌণ ব্যয়'

আর কোন্‌টা 'মুখ্য ব্যয়' তাও মার্শালই দেখিয়েছিলেন। ব্যয়-হ্রাসের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে কতকগুলি কারণ 'আভ্যন্তরীণ' অর্থাৎ বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নৈপুণ্যের নিদর্শন এবং অন্য অনেক কারণ 'বাহ্যিক', অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তার বিশেষ তৎপরতা না থাকলেও সেগুলির সুবিধা পাওয়া যাবে। টাটা কোম্পানির ম্যানেজার যদি একটু সুষ্ঠু শ্রমবিভাগের ফলে সস্তায় ইস্পাত তৈরি করতে পারেন তবে ব্যয় হ্রাস হল 'আভ্যন্তরীণ' কারণে; কয়লা চলাচল সস্তা হয়ে যাওয়াতে যদি ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় কমে যায় তবে সে ব্যয় হ্রাস হয় 'বাহ্যিক' কারণে। উৎপাদনের উপায়, গড়ন এবং পরিমাণ যখন অনবরত বদলাচ্ছে তখন একটা 'প্রতীক প্রতিষ্ঠানে'র কল্পনা করে নেওয়ার নির্দেশও মার্শালই দিয়েছিলেন।

মার্শালের লেখায় আজকাল অনেক খুঁত ধরা পড়ে, বিশেষত তাঁর প্রবর্তিত দ্রব্যমূল্যের আলোচনায়। একটি একটি করে জিনিস আলাদা করে নিয়ে তার চাহিদা ও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে সমস্যা সহজ হয়: কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ থাকে না। দ্রব্যমূল্য বিশেষের সাম্যস্থিতির কারণ নির্ধারণের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন কি কারণে দ্রব্যমূল্যের 'সার্বিক সাম্যস্থিতি' আসতে পারে তার অনুসন্ধান। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সুইডেনে হ্বিক্‌সেল সার্বিক সাম্যস্থিতির আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তব কারণের সঙ্গে আর্থিক কারণের যোগসূত্র খুঁজে পান এবং আধুনিক অর্থতত্ত্ব আলোচনার দরজা খুলে দেন। এই সুইডেনেরই গুস্তাফ ক্যাসেল দ্রব্যস্বল্পতা থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি জ্ঞাত 'স্থির' কারণ এবং সবগুলি অজ্ঞাত দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সমীকরণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। মার্শালের প্রবর্তিত ধারার বিরোধী আর একটা মতবাদ গড়ে উঠেছে আমেরিকায়। অনেকে মার্শালকেও ক্লাসিক্যালদের পর্যায়ে

ফেলতে চান কারণ রিকার্ডোর চিন্তাধারা তাঁর প্রত্যেক পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। আমেরিকার ক্লার্ক প্রমুখ লেখকদের রচনাতে রিকার্ডোর সঙ্গে সংগতি রক্ষার চেষ্টা অনেকাংশে বর্জিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ধনবিজ্ঞান আলোচনায় মার্শালের প্রভাব খুব বেশি পিগূর রচনায়। পিগূর 'ইকনমিক্‌স্ অব্ ওয়েলফেয়ার' এর পাতায় পাতায় অবশ্য মার্শাল-বিরোধী মন্তব্য দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে মার্শাল লিখেছিলেন ১৮৯০ সালে, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ধনতন্ত্র যখন সগৌরবে বিরাজ করছে, মানুষের যখন বিশ্বাস আছে যে স্বার্থবুদ্ধি এবং শুভবুদ্ধি প্রায় একই জিনিস। পিগূ লিখেছেন গত মহাযুদ্ধের দু বছর পরে, যখন ধনিকতন্ত্র সংঘবদ্ধ একচেটিয়া ব্যবসায়ের রূপ নিয়েছে এবং অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থ-সংঘর্ষের বিষময় ফল সম্বন্ধে যখন আর সন্দেহ নেই। তাই পিগূর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মার্শালের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে মেলে না; কিন্তু পিগূর বিচার-পদ্ধতি, আলোচনার প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে মার্শালীয়। যদি মার্শাল ১৮৯০ সালে না লিখে ১৯২০ সালে লিখতেন তবে তাঁর হাত দিয়ে ইকনমিক্‌স অব ওয়েলফেয়ারই বেরত।

পিগূর আগেও হবসন ইত্যাদি কয়েকজন স্বাচ্ছন্দ্যতত্ত্বের দিক দিয়ে ধনবিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিন্তু পিগূর মতো বৈজ্ঞানিক এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের কারও রচনায় পাওয়া যায়না। পিগূ সূচনাতেই বলেছেন যে জ্ঞান দুরকমের— যে জ্ঞান আলো আর যে জ্ঞান ফল দেয়, এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যেকটার মধ্যেই দুটো দিকই আছে। ধন-বিজ্ঞানের 'আলোক-সন্ধানী' দিকটার মূল্য সব চেয়ে বেশি হবে তখনই যখন সমাজের কাজে তাকে 'ফলপ্রসূ' করে তোলা যাবে। সমাজের সব চেয়ে বড় আদর্শ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি এবং এই স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর নানা উপায় সন্ধানই পিগূর উদ্দেশ্য। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সবটাকে অবশ্য

পরিমাপ করা যায় না ; সুতরাং যেটুকুকে অর্থের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় আমরা শুধু সেটুকু বাড়ানোর পন্থা নির্দেশ করতে পারি। এই 'পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য' নির্ভর করে প্রধানত তিনটি জিনিসের উপরে— কতটা ধন উৎপন্ন হয়, কি ভাবে ধন বণ্টিত হয় এবং কি রকম করে উৎপন্ন জিনিসগুলিকে ভোগ বা ব্যবহার করা হয়। বণ্টন এবং ব্যবহার পদ্ধতি অপরিবর্তিত আছে ধরে নিলে বলা যায় যে উৎপাদন যত বেশি হবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও ততই বাড়বে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো বাধা না থাকে এবং প্রত্যেক দিকে বাঞ্ছনীয় অনুপাতে উপাদান প্রয়োগ সম্ভব হয় তবে অবশ্য উৎপাদন যথাসম্ভব বেশি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এটা সম্ভব হয় না নানা কারণে— অজ্ঞতা, এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে উপাদান সরিয়ে আনার ব্যয় এবং অসুবিধা, উপাদানগুলিকে বাঞ্ছনীয় ভাবে বিভক্ত করতে না পারা ইত্যাদি। যদি এই অসুবিধা এবং অন্তরায়গুলিকে দূর করা যায় তবে উৎপাদন বৃদ্ধি সহজেই করা যাবে।

কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ ব্যক্তির লাভ এবং সমাজের লাভ অনেক সময়েই এক নয়। যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন-কার্য ব্যক্তির হাতে ততদিন ব্যক্তিগত লাভের আশা যেদিকে বেশি সেদিকেই শ্রম এবং মূলধন নিযুক্ত করা হবে, সমষ্টির তাতে লাভ হোক আর নাই হোক। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যের বিরোধ নানাস্থানে। জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে যদি সে জমিতে আমি স্থায়ী কোনো উন্নতি করি তবে তাতে আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমাজের লাভ বেশি (অবশ্য সমাজের মধ্যে আমাকেও ধরে নিয়ে), শহরের ঘিঞ্জি গলিতে বাড়ি তৈরি করে সম্মুখে যদি আমি একটু খোলা জমি রাখি তবে তাতে যেমন আমি আলো-হাওয়া পাব, তেমনি আমার প্রতিবেশীরাও

পাবে ; সে ক্ষেত্রেও আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমাজের লাভ বেশি। আবার আমার বাড়িতে আমি যদি ফ্যাক্টরি খুলি তবে তাতে আমার লাভ, কিন্তু প্রতিবেশীর হবে স্বাস্থ্যহানি ; তাড়ির দোকান খুলে আমি হয়তো অনেক টাকা করে নিতে পারি, কিন্তু সমাজের তাতে অমঙ্গল এবং মাতালের হল্লা কমাতে গিয়ে সরকারের পুলিশের খরচ বৃদ্ধি। একচেটিয়া ব্যবসায়ে বা যে ব্যবসায়ে অন্যের উপরে অসুবিধা বা এমন কি খরচের বোঝাও চাপানো যায় সে ব্যবসায়ে এবং আরো এমন অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির লাভ ও সমাজের লাভের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

পিগূর বক্তব্য এই যে, যদি পর্যাপ্ততম স্বাচ্ছন্দ্য লাভই সমাজের আদশ হয় তবে যেখানে ব্যক্তির লাভের চেয়ে সমাজের লাভের সম্ভাবনা বেশি সেখানে আর্থিক সাহায্য বা অন্য যে কোনো উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে। ব্যক্তির লাভের হারকে বাড়িয়ে দিতে পারলেই সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর যেখানে ব্যক্তির লাভ বেশি, সমাজের লাভ কম, সেখানে ট্যাক্স বসাও, অন্যপ্রকার বাধা সৃজন কর, যাতে ব্যক্তির লাভ কমে যায় এবং উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে কমে। যে রেল লাইন খুলবে, রাস্তা তৈরি করবে, এমন জিনিস উৎপাদন করবে যা সস্তা এবং প্রয়োজনীয় তাকে সাহায্য কর, আর যে নিজের লাভের আশায় অন্যের স্বাস্থ্যহানি এবং অসুবিধা ঘটাবে তাকে সর্বপ্রকারে বাধা দাও। অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র বজায় রেখে যতটা সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় পিগূতে তারই পথ এঁকে দেওয়া আছে। তাঁর লেখা নূতনতর বই ‘ক্যাপিটালিজম্ ভার্সাস্ সোশ্যালিজম’এ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণতর হয়ে এসেছে, কিন্তু বর্তমান সমাজ-গঠনের মূলরূপটির কার্যকারিতার উপরে তাঁর এখনো আস্থা আছে। তাঁর মতে এই সমাজ দিয়েই কাজ চলবে যদি প্রত্যেক পদে সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

আর একধাপ অগ্রসর হলেই পুরোপুরি সমাজতন্ত্রী হওয়া যায়। পিগু শেষ ধাপের ঠিক আগে থেমে গেছেন, কারণ মানুষ ব্যক্তি হিসাবে স্বার্থান্বেষী ছাড়া আর কিছু নয় এ ধারণা তাঁর অচঞ্চল। সমাজতন্ত্রী স্বার্থান্বেষণকে একেবারে দূরে ফেলে সমষ্টির কল্যাণকে একমাত্র প্রেরণা এবং লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন এবং তাঁর এ বিশ্বাস আছে যে সমষ্টির কল্যাণসন্ধানী সমাজে ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তনও ক্রমে হবে।

মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত শুভবুদ্ধি এবং প্রকৃতির কল্যাণহস্তের উপরে বিশ্বাস আজ আর কারও নেই বললেই চলে। মার্শাল এবং পিগুর শিষ্য লর্ড কেইন্‌স্ তাঁর প্রামাণিক বই 'জেনারেল থিওরি'তে দেখিয়েছেন যে আধুনিক উৎপাদন ও মূলধন বিনিয়োগ প্রথা যে রকম তাতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের পক্ষে 'অনৈচ্ছিক কর্মহীনতা' আসতে বাধ্য, এবং যদি বা চেষ্টা করে আজকে লোককে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তারই ফলে কালকের সমস্যা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ধনবিজ্ঞানের আলোকসন্ধানী দিকের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে; অন্যদিকে ব্যাবহারিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনা এবং বিশেষত 'মন্দা'র সময়ের অর্থনীতি আলোচনা সন্দেহ জাগিয়েছে, প্রশ্ন তুলেছে, বাধা খুঁজে বার করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা অতিক্রম করার পথও দেখিয়েছে। উন্নতির পথে বাধা কোথায় সেটা না জানতে পারলে অতিক্রমের উপায়ও পাওয়া যায় না। আর্থিক উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা দশবার্ষিক পরিকল্পনা কিংবা সমাজতন্ত্র সব কিছুই প্রকৃতির কল্যাণহস্তের উপরে অবিশ্বাস এবং আধুনিক মানুষের বুদ্ধিজাত নিয়ন্ত্রণের উপরে আস্থা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে।

ধনবিজ্ঞান। শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	২৩	কেনে	কিনে
৬১	৬	পুঁজবে	খুঁজবে
৬৬	১০	ও মূল্য	মূল্য
৭১	১	ম্যান	ম্যান (Mun

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।" —লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১. বিশ্বপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান: শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয়: শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য: শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব: শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা: শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী